boierpathshala.blogspot.com

সম্পূর্ণ উপন্যাস

চাবি-রহস্য

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

ছবি: সঞ্জীবন বসু

আজ ঝিনুকের প্রোফেসর বি ডি-র বাড়িতে পড়তে যাওয়ার দিন। বাবা বলেছিলেন, "টিউশন শেষ হওয়ার পনেরো মিনিট আগে আমাকে একটা মিস্‌ড কল দিস। আমি বউবাজারের কাছাকাছি থাকব, তোকে তুলে নেব।" বাবার সঙ্গে গাড়িতে ফেরার একটা মজা আছে, রেস্তরাঁয় খাওয়ার বায়না করলে, সচরাচর 'না' করেন না। ঝিনুকদের গাড়ি এখন পার্কস্ট্রিটের

boierpathshala.blogspot.com

ফ্লাইওভারে।

আড়চোখে বাবার মুডটা বুঝে নিয়ে ঝিনুক বলল, "অনেকক্ষণ ধরে খিদে পেয়েছে। কোথাও একটু..."

"খাবি? আচ্ছা চ', ক্যামাক স্ট্রিটে একটা চাইনিজ় রেস্তরাঁ আছে, ভাল রান্না করে। তোকে কোনওদিন খাওয়ানো হয়নি।"

বাবার এই কথাতেই ড্রাইভার আশুদা যা নির্দেশ পাওয়ার পেয়ে গেল। ঝিনুক গা ঝাড়া দিয়ে বসে মনে-মনে ঠিক করতে থাকল, কী-কী আইটেম অর্ডার দেবে।

ফ্লাইওভার থেকে নেমে আশুদা রাস্তার বাঁ দিক ধরে গাড়ি চালাচ্ছে। একটু পরেই থিয়েটার রোডে ঢুকে ক্যামাক স্ট্রিট পৌঁছবে। বাবা বলে উঠলেন, "এখানেই যখন এলাম, দীপঙ্করের অফিসে একবার ঢুঁ মেরে যাই, কী বলিস? ওকেও বলব আমাদের সঙ্গে খেতে।"

দীপকাকুর সঙ্গে সময় কাটানোর ব্যাপারে ঝিনুক সব সময় উৎসাহী। বলল, "অফিসে কি পাওয়া যাবে? বেশিরভাগ সময় তো বাইরেই থাকেন!"

"দ্যাখ না, একবার ফোন করে," বললেন বাবা।

ঝিনুক নিজের মোবাইল সেটটা চোখের সামনে তুলেও ফোন করল না। লাভ নেই কোনও। দীপকাকু ফোন ধরেন মর্জিমতো। তার চেয়ে অফিসের এত কাছে যখন এসে পড়েছে, দেখে নেওয়াই ভাল।

একটা বিশাল বিল্ডিং-এর চারতলায় দীপকাকুর ডিটেকটিভ এজেন্সি। অফিসঘরের সামনে এসে ঝিনুকের বাবা, ঝিনুক পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ঘরটার ভোল সম্পূর্ণ বদলে ফেলেছেন দীপকাকু। কাচের দেওয়াল, দরজা। ভিতরে ক্লায়েন্ট বসার সুদৃশ্য সোফা, সেন্টার টেবিল। তার উপর ফুলদানি। দীপকাকুর নিজস্ব কেবিন হয়েছে। সেটাও কাচ আর কাঠ দিয়ে পার্টিশন করা। এখানে দাঁড়িয়ে ঝিনুক দীপকাকুর মাথা থেকে বুক পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। কথা বলছেন শাড়িপরা মোটাসোটা এক মহিলার সঙ্গে। সম্ভবত কোনও ক্লায়েন্ট। ভদ্রমহিলার পিঠের অংশটা দেখা যাচ্ছে।

বাবা বললেন, "বাঃ, ব্যবসা তো বেশ ফুলেফেঁপে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে!"

ঝিনুক এই কথার কোনও উত্তর দিতে পারল না। দীপকাকুর অফিসের বদল দেখে সে একেবারে থ' হয়ে গিয়েছে। ঝিনুক দীপকাকুর অফিসে খুব কমই এসেছে। শেষ কবে এসেছিল, মনে করতে পারছে না। অফিসের চেহারাটা মনে আছে, কালচে হয়ে যাওয়া

boierpathshala.blogspot.com

কাঠের ফার্নিচার, বিবর্ণ দেওয়াল। দীপকাকুর অফিসের ফোনটাও ছিল লাগোয়া অফিসের সঙ্গে প্যারালাল লাইনে। এক চান্সে দীপকাকুকে পাওয়া যেত না। ফোন প্রথমে যেত ওই অফিসে। এখন নিশ্চয়ই সেপারেট লাইন নিয়েছেন দীপকাকু। অথচ ঝিনুকদের এত বদলের কথা জানাননি!

"এ কী, আপনারা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন! ভিতরে চলুন।"

পিছন থেকে আসা কথায় ঘাড় ফেরাল ঝিনুক। সুদর্শনকাকা, দীপকাকুর অফিসের একমাত্র স্টাফ। হাতে ফ্লাস্ক। মনে হচ্ছে চা এনেছে ক্লায়েন্টের জন্য। ঝিনুক লক্ষ করল, সুদর্শনকাকার পোশাকআসাকও বেশ ঝকঝকে হয়েছে। বাবা বললেন, "তোমার দাদা খুব ব্যস্ত দেখছি।"

"ওই আরকি। আসুন না," বলে সুদর্শনকাকা এগিয়ে গিয়ে কাচের দরজা ঠেলে ঢুকল। ঝিনুকরা অনুসরণ করল তাকে।

ভিতরে পৌঁছতে, দীপকাকু নিজের চেম্বার থেকে একটা হাত একটু উপরে তুলে জানিয়ে দিলেন, ঝিনুকদের দেখেছেন। ওই ইশারার আরও একটা মানে হয়, হাতের কাজটা সেরে আপনাদের অ্যাটেন্ড করছি।

কিন্তু বাবা ওই সব সৌজন্যর ধার ধারবেন কেন? দীপকাকু তাঁর নিজের ভাইয়ের মতো। যখন খুশি তাঁর কাছে যাওয়া যেতে পারে। দু'পা এগিয়েছিলেন বাবা, সুদর্শনকাকা এসে বলল, "বাবু, আপনারা একটু ওয়েট করুন। দাদা পার্টিকে ছেড়ে দিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলবেন।"

হতাশা আর বিরক্তি নিয়ে বাবা ঝপ করে বসে পড়লেন সোফায়। দমে যাওয়া মন নিয়ে ঝিনুকও বসল পাশে। ভাবল, দীপকাকু কি তা হলে পর হয়ে গেলেন? কিন্তু কাকুর এই উত্থানের পিছনে ঝিনুকের অবদানও কিছু কম নয়।

সুদর্শনকাকা চায়ের কাপ-ডিশ বাবার সামনে রাখল। দু'জনের জন্য এনেছিল নিশ্চয়ই। ভাগ করল তিনটে। ভাগ্যিস ঝিনুক চা খায় না। মুশকিলে পড়ে যেত সুদর্শনকাকা। দু'টো চা নিয়ে সুদর্শনকাকা ঢুকল চেম্বারে। সেপারেটরের উপর দিয়ে ভেসে আসছে ভদ্রমহিলার গলা, "না না, এটা আপনাকে নিতেই হবে। আমার জন্য এতটা সময় আপনি ব্যয় করলেন।"

ঝিনুক আন্দাজ করল, মহিলা দীপকাকুকে ফিজ দিতে চাইছেন। দীপকাকু নিতে আগ্রহী নন। আচরণটা দীপকাকুর সঙ্গে ঠিক যেন মিলছে না। নিজের চার্জ বুঝে নেওয়ার ব্যাপারে কখনওই এতটুকু দ্বিধা করেন না দীপকাকু। এক্ষেত্রে কেন এরকম করছেন, জানতে কৌতূহল হচ্ছে ঝিনুকের। কিন্তু উপায় নেই। ভদ্রমহিলা এখনও বলে যাচ্ছেন, "প্লিজ, আপনাকে এটা নিতেই হবে। নয়তো খুব খারাপ লাগবে আমার।"

বাবাও উৎকর্ণ হলেন। কপালে পড়েছে ভাঁজ। ঘাড় ঘোরালেন দীপকাকুর কেবিনের দিকে।

ফিজটা বোধ হয় নিলেন দীপকাকু। ভদ্রমহিলা বেশ খুশিমুখে বেরিয়ে আসছেন। চেহারায় সম্ভ্রান্ত ঘরের ছাপ। বয়স চল্লিশের উপর। বিবাহিতা, প্রথম নজরে মানুষকে এই ভাবে দেখতে ঝিনুক শিখেছে দীপকাকুর কাছে।

ভিতর থেকে দীপকাকুর গলা ভেসে এল, "রজতদা, চলে আসুন।"

বাবা অবশ্য ডাকার অপেক্ষায় না থেকেই সোফা ছাড়লেন। ঝিনুকরা কেবিনে ঢুকল। বাবা চেয়ারে বসতে-বসতে জানতে চাইলেন, "কী ব্যাপার বলো তো! ক্লায়েন্ট টাকা দিতে চাইছে, তুমি নিচ্ছ না! টাকা কি বেশি হয়ে গেল তোমার?"

"না রজতদা, সামান্য একটা অ্যাডভাইসের জন্য এত টাকা দিয়ে গেলেন, অস্বস্তি লাগে নিতে।"

ঝিনুক দেখল, দীপকাকুর হাতে খুব সম্ভবত গোটাদশেক পাঁচশো টাকার নোট। চেয়ারে বসে ঝিনুক জানতে চাইল, ওঁর প্রবলেম কী ছিল?

"কিছুই না। ছ' মাস আগে বাড়ির কাজের মেয়েকে তাড়িয়ে ছিলেন। হাতটান ছিল মেয়েটার। যাওয়ার সময় সেই মেয়ে শাসিয়ে যায়, ভদ্রমহিলাকে দেখে নেবে। তারপর থেকেই আতঙ্কে আছেন ওই মহিলা। বাড়ি থেকে বেরনো কমিয়ে দিয়েছেন। কিছুদিন ধরে তাঁর যেন মনে হচ্ছে, বাড়ির সামনে একটা অপরিচিত ছেলে ঘুরঘুর করছে। মেয়েটাই পাঠিয়েছে নির্ঘাত। ছেলেটা নাকি একদিন সিকিউরিটি গার্ডের চোখ ফাঁকি দিয়ে ভদ্রমহিলার দোতলার বেডরুমের সামনেও চলে এসেছিল। আবছা একটা পুরুষ চেহারা সরে যেতে দেখেছিলেন সন্ধেবেলা।"

ঝিনুক বলল, "উনি পুলিশে জানাচ্ছেন না কেন?"

"ওই যে বললাম, ছেলেটাকে দেখেছেন আবছায়ায়। নিজের দেখার ব্যাপারে এখনও ততটা শিওর নন। পুলিশ কোনও ধরনের অস্পষ্ট সন্দেহকে আমল দিতে চায় না।"

দীপকাকুর বলা শেষ হতেই বাবা জানতে চাইলেন, "তুমি ওঁকে কী পরামর্শ দিলে?"

"বললাম, বাড়ির ভিতরে-বাইরে জায়গা বেছে কয়েকটা ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা লাগাতে। যার মনিটরগুলো থাকবে ওঁর লিভিংরুমে। ঘরে বসেই লক্ষ রাখতে পারবেন বাইরের কেউ যাচ্ছে-আসছে কি না।"

"ব্যস, এই সামান্য টিপ্‌স্‌টুকুর জন্য উনি তোমাকে কড়কড়ে এত নোট দিয়ে গেলেন। সাধে কি আর তোমার অফিসের চাকচিক্য এতটা বেড়েছে! এরকম কিছু ভিতু বড়লোক পার্টি পেলে, তোমার তো একেবারে পোয়াবারো! এই মানুষগুলো আসলে ভেবে পায় না, টাকাগুলো খরচ করবে কীভাবে।"

কমেন্টটা বোধ হয় পছন্দ হল না দীপকাকুর। অভিমানভারী গলায় বললেন, "রজতদা, এই ক্লায়েন্টগুলো কিন্তু এমনই-এমনই আসছে না। আমার রেপুটেশন জেনে নিয়ে তবেই আসছে। ঝিনুক তো আমায় কয়েকটা কেসে অ্যাসিস্ট করেছে। জানে, কাজগুলো কতটা কঠিন ছিল। স্পটে না থাকলেও, সেসব বৃত্তান্ত আপনিও শুনেছেন।"

PITM Wishes you a very happy Durga Puja

MBA (PART TIME / FULL TIME)

MBA-LE | M.Sc.(IT) | PGDCA | PGDBM
BBA | BCA | BSc-(IT) | COMPUTER COURSES

• AFFORDABLE COST • EXCELLENT FACULTY • INDUSTRY INTERFACE
• SKILL DEVELOPMENT WORKSHOPS • PLACEMENTS

PRAJNANANANDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & MANAGEMENT
Affiliated to WBUT & PTU Under UGC (HRD Ministry, Govt. of India)
142/4 A.J.C. Bose Road, Moulali Junction, Kolkata 700 014 Phone : (033) 32506829
94/2 Park Street, (Near Park Circus Tram Depot) Kolkata 700 017 Phone : (033) 65268432
Website: www.pitm.org, email : info@pitm.org

boierpathshala.blogspot.com

দীপকাকু কিছুটা ক্রেডিট তাকে দিচ্ছেন দেখে, ঝিনুক খুশি হল। একইসঙ্গে এটাও লক্ষ করল, অফিসটা যতই দেখনদারি হোক না কেন, দীপকাকু নিজে কিন্তু পালটাননি। সেই ওল্ড ফ্যাশনের চশমার ফ্রেম, আধা কোঁচকানো ফুলহাতা শার্ট, একটা হাতায় বোতাম নেই, চুল আঁচড়ানোটাও আগের মতোই, নাম কা ওয়াস্তে। ঝকঝকে টেবিল, নতুন কম্পিউটারের ও প্রান্তে যে মানুষটা বসে আছেন, পুরো ঘরটার মধ্যে তিনি বেমানান। জিনিয়াসরা বুঝি এরকমই হন। আশপাশটা বদলে দিতে পারলেও, নিজে থেকে যান একই রকম, মৌলিক।

বাবা বলে উঠলেন, "যাক, ওসব ছাড়ো। আমরা এসেছিলাম তোমাকে রেস্তরাঁয় খাওয়াতে নিয়ে যাব বলে। কিন্তু তুমি চোখের সামনে যেভাবে রোজগার করলে, খাওয়াতে হবে তোমাকেই।"

দীপকাকু একবাক্যে রাজি, টাকাগুলো পার্সে পুরে নিয়ে বললেন, "চলুন, যাওয়া যাক। কোথায় খাবেন বলুন?"

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন দীপকাকু। কেবিনে ঢুকল সুদর্শনকাকা, হাতে ভিজিটিং কার্ড। দীপকাকুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ভদ্রলোক এসেছেন। বললেন, আপনার সঙ্গে নাকি ফোনে কথা হয়ে আছে।"

দীপকাকু একবার চোখ তুলে বাইরেটা দেখে নিয়ে কার্ডটা পড়লেন। বিব্রত কণ্ঠে বললেন, "তাই তো, আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম অ্যাপয়েন্টমেন্টটা।"

ফের চেয়ারে বসে পড়লেন দীপকাকু। বাবার উদ্দেশে বললেন, "রজতদা, জাস্ট আ ফিউ মিনিটস। কেসটা একবার শুনে নিয়ে বেরিয়ে যাব। আমারও বেশ খিদে পেয়েছে।"

দীপকাকুর টেবিলের উলটো দিকে দু'টো চেয়ার। ক্লায়েন্টের জন্য একটা ছেড়ে দিয়ে বাবা উঠে গেলেন দীপকাকুর পাশের চেয়ারে। যেতে-যেতে বললেন, "নো প্রবলেম। অনেকদিন হয়ে গেল, তোমার ক্লায়েন্ট এবং কেস মিট করিনি। আই উইশ, তোমার এই কেসটা বেশ জমকালো হবে।"

দীপকাকু বললেন, "দেখা যাক, আপনার শুভকামনা কতটা ফলপ্রসূ হয়। বেশ কিছুদিন হল আমিও সেরকম কঠিন কোনও কেস পাচ্ছি না।"

সুদর্শনকাকা কেবিন থেকে বেরিয়ে গিয়ে ক্লায়েন্টকে পাঠিয়ে দিয়েছে। দরজা ঠেলে ঢুকলেন বছর পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের এক ভদ্রলোক। গোঁফ আছে, চোখে দামি ফ্রেমের চশমা, হাতের ঘড়িটা ব্র্যান্ড নিউ, মনে হচ্ছে বিদেশি। পরনের পোশাকও বেশ উঁচুদরের। হাতে ঝুলছে সফ্‌ট লেদারের কালো ব্রিফকেস। এত ঝকঝকে জিনিস সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও ভদ্রলোকের চেহারায় কেমন একটা বিধ্বস্তভাব।

ঘরে ঢুকে লোকটি যেন ধাঁধায় পড়ে গিয়েছেন। কারণটা টের পাচ্ছে ঝিনুক, বাবা আর দীপকাকুর মধ্যে কে যে ডিটেকটিভ, বুঝে উঠতে পারছেন না।

শেষমেশ বাবাকেই সাব্যস্ত করে নমস্কার ঠুকলেন। বাবার চেহারা রাশভারী তো, তাই। সঙ্গে-সঙ্গে নমস্কারটা বাবা পাস করে দিলেন দীপকাকুর দিকে। আঙুল দেখিয়ে বললেন, "আমি নই, ইনি।"

নমস্কারটা গ্রহণ করলেন দীপকাকু। ঝিনুকের পাশের চেয়ারটা নির্দেশ করে ভদ্রলোককে বললেন, "প্লিজ, বি সিটেড।"

ভদ্রলোক বসলেন। কালো ব্রিফকেসটা রাখলেন চেয়ারের পাশে, মেঝেতে। একটু যেন জড়সড় হয়ে আছেন মানুষটি, যা ওঁর পোশাকআসাকের সঙ্গে একেবারেই মানাচ্ছে না।

দীপকাকু বলে উঠলেন, "বলুন মিস্টার সেনগুপ্ত, আপনার সমস্যাটা।"

সেনগুপ্তবাবু ইতস্তত করছিলেন, ঝিনুক আর বাবার দিকে দেখে নিলেন। দীপকাকু বললেন, "আপনার ব্যাপারটা যদি তেমন গোপনীয় এবং ব্যক্তিগত না হয়, অনায়াসে এঁদের সামনে বলতে পারেন। এঁরা আমার খুবই নিকটজন।"

একটু যেন ফ্রি হলেন সেনগুপ্তবাবু। বললেন, "না, সেরকম গোপন করার মতো কিছু নয়। তবে ঘটনাটা আমার স্ত্রী ছাড়া এখনও কাউকে জানাইনি।"

"আমার কাছে আসার কথা আপনাকে কে বলল? তাকেও কি জানাননি ব্যাপারটা?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

সেনগুপ্ত বললেন, "আপনার কাছে পাঠালেন 'অ্যারো অ্যাড এজেন্সি'-র সুজয় ঘোষ। উনি আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। আপনি ওঁদের কোম্পানিকে কীভাবে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, সেই গল্প করলেন। তখনই আমি বুঝতে পারি, আমার প্রবলেমটা আপনিই একমাত্র সলভ করতে পারবেন। আমি অবশ্য আমার সমস্যাটা সুজয়দাকে বলিনি। শুধু একজন ভাল ডিটেকটিভের সন্ধান চেয়েছিলাম।"

সেনগুপ্তর কথা শুনে ঝিনুক বেশ উৎসাহিত হয়ে পড়ল। অ্যাড এজেন্সির কেসটা সত্যিই ভীষণ জটিল ছিল। এক-এক সময় মনে হচ্ছিল, সলভ করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু সলভ করে ফেললেন দীপকাকু। ওই ক'টা দিন ঝিনুক রুদ্ধশ্বাস অবস্থায় কাটিয়েছে দীপকাকুর সঙ্গে। সেনগুপ্তবাবুর কেসটা যদি সেরকম মানের হয়, ঝিনুক দীপকাকুকে অ্যাসিস্ট করবেই করবে। কোনও ওজর-আপত্তি শুনবে না। আবার এমনও হতে পারে, সেনগুপ্তবাবুর কেসটা হয়তো খুবই সহজ, উনি নিজে সেটা ধরতে পারছেন না। দীপকাকু এখন এই টেবিলে বসেই ব্যাপারটা সলভ করে দেবেন। যেমন, একটু আগে বড়লোক ভদ্রমহিলার ক্ষেত্রে হল। ক্লায়েন্টরা সব সময়ই নিজের সমস্যাকে বড় করে দ্যাখেন। না দেখলে দীপকাকুর কাছে আসবেন কেন?

"হ্যাঁ, এবার বলুন আপনার প্রবলেমটা," কথাটা বলে দীপকাকু দৃষ্টি স্থির করলেন সেনগুপ্তবাবুর মুখে।

বলতে শুরু করলেন সেনগুপ্ত, "আমি ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার। কার্ড দেখে সেটা এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন। পেশাটা গুছিয়ে বলি। আমি কোনও চাকরি করি না। বিভিন্ন কোম্পানিকে কনসালটেন্সি এবং টেকনিক্যাল সার্ভিস দিই। আমার ফার্মের নাম 'অ্যাডভান্স ইলেকট্রনিক্স'। মির্জা গালিব স্ট্রিটে আমার অফিস এবং ওয়ার্কশপ। খুব বড় কিছু নয়। একজন আমায় অ্যাসিস্ট করে। আর-একজন চা, জল এনে দেয়। বাড়িতেও কাজ করি, আলাদা কাজের ঘর আছে।"

"আপনি ডিগ্রি করেছেন কোন ইউনিভার্সিটি থেকে?" কথার মাঝে প্রশ্ন করলেন দীপকাকু।

"যাদবপুর। পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনও করি ওখান থেকে।"

"চাকরি নেননি কেন?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

"পড়াশোনা করতে-করতেই আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম, চাকরি কোনওদিনই করব না। যা করার নিজে করব। বললে অহঙ্কারের মতো শোনাবে, তবু এটাই ফ্যাক্ট, আমার জেদ সফল হয়েছে। আমাদের ট্রেডে আমাকে লোকে একডাকে চেনে। বহু ভাল-ভাল চাকরির অফার আমি পেয়েছি, এখনও রোজ দু'টো করে পাই। কিন্তু কোনও মূল্যেই আমি স্বাধীনভাবে কাজ করার আনন্দটা খোয়াতে চাই না।"

"বুঝলাম," বললেন বাবা।

সেনগুপ্তবাবুর দৃষ্টি গেল বাবার দিকে, বোধ হয় বুঝে নিতে চাইলেন বাবার উক্তিটা কটাক্ষ কিনা। নিশ্চিন্ত হয়ে ফের শুরু করলেন বলতে, "আমাদের লাইনে একটা ব্যাপারে আমার বিশেষ দক্ষতা আছে। বিদেশ থেকে যেসব উৎপাদন-নির্ভর ইলেকট্রনিক মেশিন আমাদের দেশে আসে, তার উৎপাদন ক্ষমতা আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। অবশ্যই হালকা ধরনের মেশিনের কথা বলছি, হেভি ইন্ডাস্ট্রি নয়। এখন যেমন আমি একটা বিস্কুট তৈরির মেশিনের প্রোডাকশন বাড়ানোর অর্ডার নিয়েছি। কিন্তু এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, অর্ডারটা তো ফুলফিল করতে পারবই না, মার্কেটে আমার সুনামটাও নষ্ট হবে।"

"ওই দুর্ঘটনাটার কারণেই আপনি আমার কাছে এসেছেন?" বললেন দীপকাকু।

"ইয়েস। এ এক আশ্চর্য চুরি। আমি কিছুতেই এর কুলকিনারা খুঁজে পাচ্ছি না। হয়েছে কী, বিস্কুট ম্যানুফ্যাকচারিং অটোমেটেড মেশিনের প্রোডাকশন বাড়ানোর কাজ ইন্ডিয়ায় প্রথমে আমিই ট্রাই নিই। মেশিনগুলো প্রধানত আসে ইতালি আর চিন থেকে। একটা ইতালির

boierpathshala.blogspot.com

মেশিনের পি সি বি বোর্ডের ডায়াগ্রাম নিয়ে কাজ শুরু করি আমি। বুঝতে পারি, বোর্ডটা আপগ্রেড করতে গেলে যেসব ইলেকট্রনিক পার্টস আমার লাগবে, ভারতের বাজারে পাওয়া সম্ভব নয়। তখন...”

কথা কেটে দীপকাকু ঝিনুকের দিকে তাকিয়ে বললেন, “পি সি বি বোর্ড মানে বুঝতে পারছ তো, টিভি, রেডিও, ডি ডি ডি-র ভিতরে এক ধরনের চৌকো, আয়তাকার সবুজ রঙের প্লাস্টিকের পাতলা বোর্ড থাকে, যাতে খুদে-খুদে নানা আকারের পার্টস লাগানো। ওই বোর্ডটাই যন্ত্রটার ব্রেন। মেশিন কন্ট্রোল হয় ওর মাধ্যমেই।”

ঝিনুক ঘাড় হেলাল। অর্থাৎ বুঝল। এতক্ষণ মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল অনেক কিছু। সেনগুপ্তবাবু ধরে নিলেন থেমে যাওয়া কথার সূত্র, “তখন ঠিক করি সিঙ্গাপুর যাব। পার্টস আনতে আগেও অনেকবার আমাকে সিঙ্গাপুর যেতে হয়েছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সিঙ্গাপুরে ইলেকট্রনিক গুডস-এর বিশাল মার্কেট আছে। এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড়।”

“হ্যাঁ, জানি। দু'টো বিখ্যাত মল আছে, সিমলিম টাওয়ার আর সিমলিম স্কোয়ার। দু'টোই বহুতল। সিমলিম স্কোয়ার সাততলা। টাওয়ারটা কত, এখন ঠিক মনে পড়ছে না।”

দীপকাকুর ফান্ডা দেখে বাবা অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকালেন। ঝিনুক মোটেই আশ্চর্য হয় না, দীপকাকুর জ্ঞানভাণ্ডার সম্বন্ধে তার সম্যক ধারণা আছে। সেনগুপ্তবাবু বলতে থাকলেন, “আজ থেকে কুড়ি দিন পিছনে মানে, তেইশ তারিখ আমি সিঙ্গাপুর রওনা দিই। আপগ্রেডেশনের ডায়াগ্রাম সঙ্গে নিয়ে যাই। তিনদিন, দু'রাত থাকি। দু'টো মল-এ শপিং করি। যা-যা চেয়েছিলাম সবই পেয়ে যাই। দেন ব্যাক টু কলকাতা। এখানে ফিরেই কাজটা নিয়ে বসিনি। অন্য কিছু কাজ ছিল, সেগুলো সেরে, গত চারদিন আগে বিস্কুটের মেশিনটা নিয়ে বসব ঠিক করি। সেইমতো যে ব্যাগে সিঙ্গাপুর থেকে পার্টসগুলো নিয়ে এসেছিলাম, সেটা সঙ্গে করে অফিস যাই। ওয়ার্কশপে বসে ব্যাগ খুলে দেখি, ডায়াগ্রাম, পার্টস কিছু নেই, আজেবাজে কাগজ ভরা। আমার তো মাথায় হাত। যে কোম্পানির জন্য কাজটা করছিলাম, সেই অর্ডারটা তো গেলই, সম্মানটাও ধুলোয় মিশল। বড় মুখ করে কোম্পানিকে বলেছিলাম, আপনাদের প্রোডাকশন আমি টেন পারসেন্ট বাড়িয়ে দেব। আরও-একটা চিন্তা মাথায় ঢুকল, জিনিসগুলো যদি আমার মতোই কোনও ইঞ্জিনিয়ার চুরি করে থাকে, তা হলে সেই ইঞ্জিনিয়ার আমার ডায়াগ্রাম আর ইলেকট্রনিক পার্টস নিয়ে বিস্কুট ম্যানুফ্যাকচারিং মেশিনের আপগ্রেডেশন শুরু করে দেবে। আমি পিছিয়ে পড়ব আমাদের সার্কিটে। এসব ছাড়াও যে ব্যাপারটা আমাকে সবচেয়ে অবাক করেছিল, তা হচ্ছে, জিনিসগুলো ব্যাগ থেকে সরল কী করে?”

“ব্যাগটাই চেঞ্জ করে দিয়েছে। এ তো সিম্পল ব্যাপার। একই রকম দেখতে অন্য একটা ব্যাগ রেখেছে আপনার ব্যাগের জায়গায়,” বলে উঠলেন বাবা।

সেনগুপ্ত মাথা নাড়লেন। বললেন, “না, ব্যাগের চাবি তো আমার কাছে। ওই চাবি দিয়েই তো খুললাম ব্যাগটা।”

বিষয়টা যে এত সরল নয়, বুঝলেন বাবা। দীপকাকুর দিকে তাকালেন মতামত শোনার জন্য। কপাল কুঁচকে দীপকাকু মন দিয়ে শুনে যাচ্ছিলেন সেনগুপ্তবাবুর কথা। এখন জিজ্ঞেস করেন, “ডুপ্লিকেট চাবিটা কোথায়, কার কাছে থাকে?”

সেনগুপ্ত বললেন, “দু'টো চাবিই আপাতত একইসঙ্গে আছে। কারণ, ব্যাগটা আমি এবারই সিঙ্গাপুর থেকে কিনেছি। পার্টস রাখার জন্য আইডিয়াল ব্যাগ। বেশ দামি। চাবি এখনও আলাদা করা হয়নি। বাড়ির আলমারির লকারে ছিল।”

“ব্যাগটা রেখেছিলেন কোথায়?” জানতে চাইলেন দীপকাকু।

সেনগুপ্ত বললেন, “ব্যাগ ছিল আমার বাড়ির ওয়ার্কশপে। কাজ করার জন্য ব্যাগটা যেদিন অফিসে নিয়ে আসি, চাবি দু'টো নিয়েছিলাম লকার থেকে।”

“ব্যাগের ভিতরের সব পার্টস লাস্ট কবে দেখেছিলেন?”

দীপকাকুর প্রশ্নের উত্তরে সেনগুপ্ত বললেন, “সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে সেদিনই বাড়িতে বসে একবার দেখেছিলাম। স্ত্রীকেও দেখালাম। যদিও এসব ব্যাপারে ওর কোনও আগ্রহ নেই। তবু মূল্যবান সংগ্রহগুলো নিজের লোককে তো একটু দেখাতে ইচ্ছে করে। আমার চার বছরের ছেলেও দেখেছে, ও মনে করে এসব জিনিস বাবার খেলনাপাতি।”

দীপকাকু গম্ভীরস্বরে “হুম,” করলেন। সামান্য বিরতি নিয়ে স্বগতোক্তির ঢঙে বলতে থাকলেন, “তার মানে, আপনার জিনিসগুলো চুরি হয়েছে কলকাতাতেই। কিন্তু কীভাবে হল? দু'টো চাবিই রেখেছিলেন লকারে। ব্যাগটা কি অন্যভাবে খোলা হয়েছে?”

সেনগুপ্তবাবু বললেন, “দেখে কিন্তু কিছু বোঝার উপায় নেই। ব্যাগটা যদি আনতাম, দেখানো যেত। ভাবলাম নিয়ে বেরোব...”

“নিয়ে বেরিয়েছেন আপনি,” বললেন দীপকাকু।

কথাটা বুঝতে না পেরে সেনগুপ্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন দীপকাকুর দিকে। ঝিনুকদের অবস্থাও একইরকম।

দীপকাকু বললেন, “ব্যাগটা আছে আপনার চেয়ারের পাশে। ভুলে গিয়েছেন ওটার কথা।”

একবিঘত জিভ কেটে সেনগুপ্ত বললেন, “এই রে, দেখেছেন, নিয়ে বেরিয়েছি আপনাকে দেখাব বলে। এদিকে খেয়াল নেই।”

ব্যাগটা টেবিলে তুলে এনে সেনগুপ্ত জানতে চাইলেন, “আপনি কী করে বুঝলেন, এটাই সেই ব্যাগ?”

“আপনি যখন চেম্বারে ঢুকেছেন, তখনই ওটার দিকে চোখ গিয়েছিল আমার। ইমপোর্টেড জিনিস। একটু আনইউজুয়াল দেখতে।”

“নাঃ, আপনার চোখের তারিফ করতে হবে,” বলে, সেনগুপ্ত কালো নরম লেদারের ব্যাগটা দীপকাকুর হাতে তুলে দিলেন। ব্যাগটা কোলের উপর নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন দীপকাকু। চাবির গর্তে এসে থামলেন। টেবিলের ড্রয়ার টেনে বের করলেন ম্যাগনিফাইং গ্লাস। চাবি লাগানোর মেটালের অংশটা খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন।

সুদর্শনকাকা ফের তিন কাপ চা নিয়ে ঢুকল। সেনগুপ্তবাবু এমনভাবে চায়ের কাপটা তুলে নিলেন, যেন এটার অপেক্ষাতেই ছিলেন। ব্যাগটা দেখা হল দীপকাকুর। ঝিনুকের দিকে ব্যাগ আর ম্যাগনিফাইং গ্লাস বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, “দ্যাখো, তোমার কী মনে হচ্ছে বলো।”

চোখের কোণ দিয়ে ঝিনুক প্রথমে সেনগুপ্তবাবুর এক্সপ্রেশন দেখল। যা ভেবেছিল তাই, দীপকাকু ঝিনুককে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন, তা সেনগুপ্ত বুঝে উঠতে পারছেন না। ওঁর তো জানা নেই ঝিনুকের আসল পরিচয়।

ব্যাগের লেদার খুবই সফ্‌ট। কোথাও কোনও হেয়ারলাইন কাটাছেঁড়ার দাগ নেই। চাবি দেওয়ার পিতল রঙের প্লেটটা দীপকাকুর মতোই আতশ কাচ দিয়ে দেখল ঝিনুক। না, আশপাশে কোনও আঁচড়ের দাগ নেই। দেখা শেষ হলে সেনগুপ্তবাবুকে বলল, “চাবি এনেছেন?”

“হ্যাঁ, এনেছি,” বলে, প্যান্টের পকেট থেকে চাবির স্টাইলিশ রিং বের করে দিলেন, যাতে দু'টো চাবিই ঝুলছে। এখনও আলাদা করেননি। করার দরকারও নেই আর। আসল জিনিস তো হাওয়া।

চাবি দিয়ে ব্যাগটা খুলে ফেলল ঝিনুক। ভিতরের বডি ক্রিম কালারের ভেলভেটে মোড়া, কোনও জিনিসপত্র নেই। একেবারে খালি।

দীপকাকু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে উঠলেন, “ভিতরে যে বলছিলেন কীসব কাগজটাগজ ছিল, সেগুলো কোথায়?”

“ফেলে দিয়েছি। কী হবে আজেবাজে কাগজ রেখে!”

“কোথায় ফেলেছেন কাগজগুলো?” জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

সেনগুপ্তবাবু বললেন, “অফিসে। ওয়েস্ট পেপার বক্সে।”

“ইমিডিয়েট অফিস অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলুন, বক্সটা সরিয়ে রাখতে। কাগজগুলো আমার দেখা দরকার।”

দীপকাকুর নির্দেশমতো নিজের মোবাইল সেট থেকে অফিসে ফোন করলেন সেনগুপ্ত। নিত্যই নামে কাউকে বললেন, “ওয়েস্ট বক্সের কিছু যেন ফেলা না হয়।”

boierpathshala.blogspot.com

ওদিকের কথা শেষ হওয়ার পর দীপকাকু ঝিনুককে জিজ্ঞেস করলেন, "কী বুঝলে ব্যাগটা দেখে?"

ঝিনুক বলল, "চাবি দিয়ে এক চান্সে খোলা হয়েছে। তার বা অন্য কিছু ব্যবহার করলে কিছু দাগ অন্তত পড়ত।"

"কারেক্ট," দীপকাকুর গলায় প্রশংসার সুর। হঠাৎ যেন খেয়াল পড়েছে, এভাবে দীপকাকু সেনগুপ্তকে বললেন, "এর সঙ্গে আপনার আলাপ করানো হয়নি, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট আঁখি সেন। নিকনেম ঝিনুক। আর ইনি হচ্ছেন ঝিনুকের বাবা রজত সেন। আমার বড়দাদার মতো।"

"আমি দেবাংশু সেনগুপ্ত," বলে সেনগুপ্তবাবু দু'জনকেই নমস্কার জানালেন। ঝিনুক এতক্ষণে ভদ্রলোকের পুরো নামটা জানতে পারল।

দীপকাকু ফিরে গেলেন কেসের প্রসঙ্গে। বললেন, "তা হলে যা বোঝা গেল, ব্যাগটা খোলা হয়েছে চাবি দিয়েই। সেটা হয়তো আসল অথবা নকল চাবি।"

"নকল চাবি কী করে বানাবে চোর? আসল দু'টো চাবিই তো ছিল আমার লকারে," বললেন সেনগুপ্ত।

"আপনার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ কি ওই লকারটা ব্যবহার করে?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

"না। বাড়িতে আমরা তিনজন মানুষ। ছেলে ছোট, লকারে হাত দেওয়ার তো কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমি আর আমার স্ত্রী লকার খোলা-বন্ধ করি।"

"এই চুরির ব্যাপারে কোনও বিশেষ ব্যক্তিকে আপনার সন্দেহ হয়?" সেনগুপ্তবাবুর উদ্দেশে দীপকাকুর প্রশ্ন।

দেবাংশু সেনগুপ্ত বললেন, "কাকে সন্দেহ করি বলুন তো? পুরো ব্যাপারটাই তো আমার কাছে ভোজবাজির মতো লাগছে। চাবি আমার কাছে, অথচ ব্যাগের ভিতর থেকে জিনিস উধাও হয়ে গেল।"

দীপকাকু বললেন, "ভোজবাজি মানে তো ম্যাজিক, সেখানে কিন্তু মন্ত্রের কোনও ব্যাপার নেই। কারসাজি লাগে। চুরিটাও হয়েছে অতীব ধূর্ত কারও কারসাজিতে। একটা সন্দেহভাজনের তালিকা তৈরি করে আমাদের এগোতে হবে।"

"তালিকায় মাত্র একজনকে আমি দেখতে পাচ্ছি। আমার স্ত্রী। কিন্তু সে এসব ইলেকট্রনিক ব্যাপার থেকে শতহস্ত দূরে থাকে। তা ছাড়া তাকে আমি নিজের চেয়েও বেশি বিশ্বাস করি।"

আঙুল দিয়ে টেবিলের পেপারওয়েট ঘোরাতে-ঘোরাতে দেবাংশুবাবুর কথাটা শুনলেন দীপকাকু। ঘোরানো থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইলেন, "আপনার ডায়াগ্রাম, স্পেয়ার পার্টস পেলে কার-কার লাভ হবে বলে মনে হয়?"

"লাভ তো হবে সবক'টা অটোমেটেড বিস্কুট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির। কিন্তু 'গ্রেট বাইট' কোম্পানির মালিক ছাড়া তো কেউ জানেই না যে, মেশিনের স্পিড বাড়ানোর পদ্ধতি আমি বের করে ফেলেছি। ওদের কাছ থেকে কাজের বরাতটা নিয়েছিলাম।"

"কত টাকার এগ্রিমেন্ট হয়েছিল?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

"দশ লাখ।"

"দশ!" চোখ বড়-বড় করে বলে উঠলেন বাবা। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "ওই সব মেশিনের দাম কত?"

"দেড় কোটির কাছাকাছি," বললেন সেনগুপ্ত।

ঝিনুক বড় করে ঢোক গিলল। দেখল, বাবারও কণ্ঠনালী ওঠানামা করছে। দীপকাকু নির্বিকার। জিজ্ঞেস করলেন, "কাজটার জন্য কোনও অ্যাডভান্স নিয়েছিলেন?"

"নিইনি। চাইলেও দিত না। কাজ দেখে দেবে। ওরা বিশ্বাস করতে পারছে না বিদেশ থেকে কেনা মেশিনের প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি কলকাতার কোনও সাধারণ ইঞ্জিনিয়ার বাড়িয়ে দেবে। তাই খাতায়-কলমে একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে। কাজটা যদি আমি সাকসেসফুলি করতে পারি, ওই অ্যামাউন্টের টাকা আমায় দেবে। টাকাটা বাঁচানোর জন্য ওরা চুরি করাতেই পারে আমার জিনিসগুলো। সেক্ষেত্রে, একজন ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার লাগবে ওই সব স্পেয়ারপার্টস মেশিনে ইনস্টল করতে।"

"ওদের কোম্পানিতে কি সেরকম ইঞ্জিনিয়ার কেউ আছে?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

সেনগুপ্তবাবু বললেন, "আছে একজন। তার দ্বারা এসব কাজ সম্ভব নয়। এরা বাঁধা গতের কাজ করতে ভালবাসে বলেই, চাকরি বেছে নেয়। ইনোভেশনের কোনও আগ্রহ নেই।"

"আপনার মতো ইঞ্জিনিয়ার ক'জন আছে, যাদের আপনি জানেন?"

"কলকাতায় আছে দু'জন। বলা যেতে পারে ইস্টার্ন ইন্ডিয়ায় এরাই আমার কম্পিটিটর। দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরুতে কয়েকজন আছে, যাদের নাম আমি শুনেছি, কাজের সঙ্গে তেমন পরিচিত নই।"

"কলকাতার দু'জনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন?"

"'হ্যালো' 'হাই'-এর একটা রিলেশন আছে। কাজের ক্ষেত্রে কেউ কাউকে হেল্প করি না। সেখানে আমরা হার্ডকোর প্রফেশনাল।"

সেনগুপ্তবাবুর উত্তরের পর দীপকাকু চুপ করে গেলেন। হাত দু'টো জড়ো করে রেখেছেন টেবিলে। কপাল কুঁচকে কী যেন ভাবতে লাগলেন। ঘরে শুধু ফ্যান চলার মৃদু শব্দ। একটু পরে দীপকাকু বললেন, "তা হলে যা দেখা যাচ্ছে, চুরি যাওয়া জিনিসগুলো পেলে আপনার জানাশোনার মধ্যে তিনজনের লাভ। দু'জন আপনার কম্পিটিটর আর বিস্কুট কারখানার মালিক। চুরিটা সম্ভবত এঁরা করেননি। কোনও পেশাদার নিয়োগ করেছিলেন। আবার এমনও হতে পারে, চুরির ছকটা তাঁদের মাথা থেকে বেরিয়েছে। কারণ, তাঁরা যথেষ্ট ইনটেলিজেন্ট। চুরিটা করিয়েছে আপনার আশপাশের কাউকে দিয়ে।"

আবার থামলেন দীপকাকু। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "আপনার অফিসে স্টাফ তো বললেন দু'জন। যে আপনাকে টেকনিক্যাল কাজে হেল্প করে, সেও কি ইঞ্জিনিয়ার? আপনার জিনিসগুলো চুরি করে কাজে লাগাতে পারবে?"

"না। ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা কোনওটাই তথাগতর নেই। অর্ডিনারি বি এসসি। এখনও কাজ শেখার পর্যায়ে আছে।"

"ওকে দিয়ে চুরি করানোটা হয়তো সম্ভব," বললেন দীপকাকু।

সেনগুপ্ত বললেন, "কিন্তু চুরিটা ও করবে কখন? ব্যাগটা তো ওর নাগালের মধ্যেই ছিল না। তা ছাড়া ও ততটা চোস্ত ছেলেও নয়।"

"আর নিতাই? যাকে একটু আগে ফোন করলেন আপনি?"

"সে বরং তথাগতর চেয়ে চালাকচতুর। তবে ছেলেটা অফিসের গোড়াপত্তন থেকে আছে। অফিসটাকেই ঘরবাড়ি মনে করে। রাতে শোয় অফিসের ওয়ার্কশপে।"

"বাড়িতে কাজের লোক?"

"একটি। বাপনের মা। তার আসল নাম জানি না। সকাল-সন্ধে একবার করে আসে। চার বছর ধরে কাজ করছে। এখন পর্যন্ত হাতটানের কোনও নিদর্শন দেখায়নি।"

"ভেরি গুড," বলে, ফের চুপ করে গেলেন দীপকাকু। এই 'ভেরি গুড'-এর মানে ঝিনুক জানে। কেসটা দীপকাকুর বেশ পছন্দ হয়েছে। ঝিনুকেরও মনে হচ্ছে, অ্যাড এজেন্সির কেসের মতোই জটিল দেবাংশু সেনগুপ্তর কেসটা। চুরিটা হয়েছে এত নিখুঁতভাবে, কোনও দিশা পাওয়া যাচ্ছে না।

দীপকাকু বলে ওঠেন, "ঠিক আছে। আমি কাল ফার্স্ট আওয়ারে আপনার অফিসে যাব। আমার ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন শুরু হবে ওখান থেকেই।"

স্বস্তির শ্বাস ফেললেন সেনগুপ্ত। বললেন, "খুব ভাল কথা। চলে আসুন অফিসে। সব শুনে কী মনে হল? বমালসমেত চোরকে ধরা যাবে তাড়াতাড়ি?"

প্রশ্নটা এড়িয়ে দীপকাকু জানতে চাইলেন, "আপনার জিনিসগুলো যদি কোনও ইঞ্জিনিয়ারের হাতে যায়? মেশিন আপগ্রেডেশন করতে তার কতদিন লাগতে পারে?"

"তা ধরুন, আমার ডায়াগ্রামটা বুঝতে দিনচারেক লাগবে। তবে সেই ইঞ্জিনিয়ার যদি ইতিমধ্যে ওই মেশিনেব আপগ্রেডেশন নিয়ে কাজ

boierpathshala.blogspot.com

শুরু করে দিয়ে থাকে, তা হলে হয়তো একদিন। যদিও তারপর হচ্ছে আসল কাজ, বারোটা কন্ট্রোল সার্কিট বোর্ডে আমার স্পেয়ার পার্টস ইনস্টল করতে হবে। পুরো কাজটা শেষ করতে কমপক্ষে দিন দশ-বারো তো লাগবেই।"

দীপকাকু বললেন, "এনাফ টাইম। আশা করি এর মধ্যে চোরকে শনাক্ত করতে পারব। যদি না এর পিছনে অন্য কোনও গল্প লুকিয়ে থাকে।"

"অন্য গল্প বলতে?" অবাক হয়ে জানতে চাইলেন সেনগুপ্ত।

দীপকাকু বললেন, "সেসব আমার উপর ছেড়ে দিন। কাল দেখা হচ্ছে।"

দেবাংশুবাবু এবার বললেন, "আপনার চার্জটা যদি একটু বলেন, অ্যাডভান্স কিছু করতে, তাও বলুন। আমি চেক বই সঙ্গে নিয়ে এসেছি।"

দীপকাকু বললেন, "চার্জটা এখনই বলা খুব মুশকিল। কাজটা নিয়ে খানিকটা এগোই। অ্যাডভান্স আপনি যে-কোনও অ্যামাউন্ট করতে পারেন।"

বুক পকেট থেকে চেক বই বের করে টাকার অঙ্কটা লিখলেন দেবাংশুবাবু। সই আগেই করা ছিল। পাতা ছিঁড়ে চেকটা এগিয়ে দিলেন দীপকাকুর দিকে। চোখ না বুলিয়েই দীপকাকু চেক চালান করলেন ড্রয়ারে।

দেবাংশু সেনগুপ্ত এবার উঠে পড়লেন। তিনজনকেই বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন কেবিন থেকে। ওঁর যাওয়ার দিকে অলসভাবে তাকিয়ে রইলেন দীপকাকু, মাথাটা হেলান দিয়েছেন নিজের দু'হাতের পাতায়।

বাবা বললেন, "কী ব্যাপার? এরকম ঝিমিয়ে গেলে কেন? চেকটাও ভাল করে দেখলে না। কেসটা কি তোমার মনঃপূত হয়নি?"

"হয়েছে। আবার একথাও মনে হচ্ছে, কেসটা ফল্‌স। এত অনবদ্য চুরি যে করবে, সে খামোকা ওই সব জিনিস চুরি করতে যাবে কেন। দশ লাখের জিনিস, চোরাই বলে হয়তো পাঁচ পাবে। বুদ্ধিটা সে আরও দামি-দামি জিনিস চুরি করার পিছনে লাগাতে পারত। আমার তো মনে হচ্ছে সেনগুপ্তর সুনাম নষ্টের অজুহাতে কেউ ওঁকে আমার রেপুটেশনের ক্ষতি করতে পাঠিয়েছে।"

কথাটা শেষ হতেই বাবার মুখ থেকে শুধু "অ্যাঃ" শব্দটা বেরিয়ে এল। ঝিনুকও বেশ অবাক হল, এই দিকটা তো সে ভেবে দেখেনি।

দীপকাকু কিন্তু নিজের জায়গায় ঠিক আছেন। উনি বললেন, "যে-কোনও কেসে সন্দেহের বাইরে কাউকেই রাখবে না। তাই যিনি তদন্তের ভার দিলেন, তাঁকেও রাখা হল সন্দেহের তালিকায়।"

দু' হাত দু'দিকে ছড়িয়ে একটু আড়মোড়ামতো ভেঙে দীপকাকু বললেন, "চলুন রজতদা, খাওয়ার কথা তো দেখছি ভুলেই গিয়েছেন আপনারা।"

সত্যিই ভুলে গিয়েছিল ঝিনুক। কেসটার যা মেরিট, ভুলে যাওয়ারই কথা। এই তদন্তে দীপকাকুর সঙ্গে তাকে থাকতেই হবে।

॥ ২ ॥

খুব একটা পীড়াপিড়ি কিছু করতে হয়নি, দীপকাকু রাজি হয়েছেন সেনগুপ্তবাবুর কেসে ঝিনুককে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিতে। ঝিনুকের পড়াশোনার চাপও এখন কম। বাবা তো পারমিশন দিয়েই রেখেছেন। মা যথারীতি একটু গাঁইগুই করছিলেন, "আচ্ছা দীপঙ্কর, প্রতিবারই তোমাদের কেস শেষ হওয়ার পর দেখি, ঝিনুক হাত-পা ছেড়েকুটে এসেছে। তুমি থাকো একেবারে ফ্রেশ। ওকে কি মারদাঙ্গার জন্য সঙ্গে নাও?"

উত্তরে দীপকাকু বলেছিলেন, "ঝিনুকের কী মুশকিল হচ্ছে জানেন বউদি, কখনও-কখনও একটু বেশিই উৎসাহ দেখিয়ে ফ্যালে, যার চিহ্ন হাত-পায়ে রয়ে যায়।"

শুনে রাগ হয়ে গিয়েছিল ঝিনুকের। গতবার যখন অযোধ্যা পাহাড়ে দীপকাকুকে কটেজের মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছিল, দৌড়ে এসে জাম্প দিয়ে ঝিনুক দরজা না ভাঙলে, ব্যাপারটা খারাপ দিকেই গড়াত। সেসব মনে না করিয়ে ঝিনুক অপেক্ষা করছিল দীপকাকুর বাইকের পিছনে উঠে বসার।

আশা পূর্ণ হয়েছে। দীপকাকুর সঙ্গে ঝিনুক এসে পৌঁছেছে মির্জা গালিব স্ট্রিটে দেবাংশু সেনগুপ্তর অফিসে। ভদ্রলোক অপেক্ষাতেই ছিলেন, দীপকাকুকে দেখে চনমনে হয়ে উঠলেন। বিশেষ কথায় না গিয়ে দীপকাকু প্রথমেই বললেন, "ওয়েস্ট বক্সটা নিয়ে আসুন। ব্যাগের মধ্যে যেসব কাগজ ছিল, দেখব।"

যে লোকটি ওয়েস্ট বক্সটা নিয়ে এল, সম্ভবত তার নামই নিতাই। সেনগুপ্তবাবুর অফিসের বেয়ারা। দীপকাকু ফ্লোরে উপুড় করে দিলেন বক্স। দোমড়ানো-মোচড়ানো নিউজ় পেপারই বেশি। বাংলা, ইংরেজি মেশানো। কভারছেঁড়া ম্যাগাজ়িনও দেখা গেল। মেঝেতে উবু হয়ে বসে দীপকাকু এখন ওই সব কাগজপত্র সোজা করে নিয়ে মন দিয়ে এপিঠ-ওপিঠ দেখতে লাগলেন। কেন দেখছেন, ঝিনুক তখনও বুঝতে পারেনি। ঘরের বাকি তিনজনের ঝিনুকের মতোই অবস্থা। ওই তিনজনের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই দেবাংশু সেনগুপ্তর টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট তথাগত। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। একটু গোলগাল ভালমানুষ চেহারা। অভিব্যক্তি চেপে রাখতে জানে না। দীপকাকুর কাজকর্ম দেখে কেমন যেন একটু 'হাঁ' হয়ে আছে। তুলনায় নিতাই অ্যাকটিভ এবং কৌতূহলপ্রবণ। দীপকাকুর চেয়ে একটু তফাতে নিলডাউন হয়ে এমনভাবে বসেছে, যেন যে-কোনও নির্দেশের জন্য স্রে প্রস্তুত।

ঝিনুক জানে, সেনগুপ্তবাবুর মতো অফিসের এই দু'জন স্টাফও দীপকাকুর সন্দেহের তালিকায় আছে। চেহারা এবং অভিব্যক্তির নিরিখে দেবাংশু সেনগুপ্তর অ্যাসিস্ট্যান্টটিকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়াই যায়। দীপকাকু কিন্তু দেবেন না। যেমন দেননি দেবাংশু সেনগুপ্তকেও। কাল দীপকাকুর অফিস থেকে বেরিয়ে ঝিনুকরা যখন রেস্তরাঁয় বসেছিল, বাবা বলেছিলেন, "আমার কী মনে হচ্ছে জানো তো দীপঙ্কর, সেনগুপ্তর কেসটা একেবারেই বোগাস। কেসটা নিয়ে ভাবার কোনও মানেই হয় না।"

"কেন একথা বলছেন?" চামচে চিংড়ি গেঁথে মুখে তুলতে-তুলতে জানতে চেয়েছিলেন দীপকাকু।

বাবা বললেন, "লোকটা বিচ্ছিরি রকমের ভুলোমনের। দেখলে না, ব্রিফকেস সঙ্গে নিয়ে এসেছে দেখানোর জন্য, অথচ ভুলে বসে আছে। আমার ধারণা, জিনিসপত্র ওই ব্যাগে সেনগুপ্ত রাখেইনি। অথবা বের করে অন্য কোথাও রেখেছে, এখন গিয়েছে ভুলে।"

খেতে-খেতে দীপকাকু মিটিমিটি হাসছিলেন। বললেন, "আমিও তো কম ভুলোমনের নই। ঝিনুক বেশ কয়েকবার তার প্রমাণ পেয়েছে। কিন্তু আমি যখন কোনও ইনভেস্টিগেশনে জড়িয়ে থাকি, তার অতি ছোটখাটো তথ্যও ভুলি না। আসলে, নিজের কাজে অতিরিক্ত মনোযোগ দিতে গিয়ে বাইরের কিছু ব্যাপার ভুলভাল হয়ে যায়। ঠিক তেমনই, স্পেয়ার পার্টস, ডায়াগ্রাম সেনগুপ্ত ব্যাগেই রেখেছিলেন। জিনিসগুলো হারিয়ে যেতে, ব্যাগটা তাঁর কাছে মূল্যহীন হয়ে গিয়েছিল।"

হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান জিনিসগুলো খুঁজে পেতে দীপকাকু কাজ শুরু করে দিয়েছেন সিরিয়াসলি। এখন যা-যা দেখছেন, কিছুই ভুলছেন না। অথচ সেনগুপ্তর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ভুলে ঝিনুকদের সঙ্গে খেতে চলে যাচ্ছিলেন। ক্লায়েন্ট এবং ডিটেকটিভের চরিত্রে বেশ মিল আছে।

কাগজগুলো দেখা হল দীপকাকুর। নিতাইকে বললেন, "এগুলো একটা প্যাকেটের মধ্যে রেখে দাও। পরে আমার কাজে লাগতে পারে।"

দীপকাকু উঠে দাঁড়াতেই সেনগুপ্তর অ্যাসিস্ট্যান্ট চেয়ার এগিয়ে দিলেন।

বসলেন দীপকাকু। অ্যাসিস্ট্যান্টকে দেখিয়ে সেনগুপ্তবাবুকে প্রশ্ন করলেন, "এঁর পরিচয়?"

"তথাগত বসু। যার কথা আপনাকে বলেছিলাম, আমার টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট।"

দেবাংশুবাবুর বলা শেষ হতেই তথাগত অতি বিনয়ে দীপকাকুর

boierpathshala.blogspot.com

উদ্দেশে হাত জোড় করলেন। দীপকাকু আধো প্রতি নমস্কার জানিয়ে দেবাংশুবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাগটা অফিসে এনে প্রথমে কোথায় রেখেছিলেন?"

"সোজা ওয়ার্কশপে ঢুকেছিলাম ব্যাগটা নিয়ে।"

"ওয়ার্কশপটা কোন দিকে?"

"এই তো অফিসঘরের পিছনেই। যাবেন তো চলুন। তার আগে একটু চা খেলে হত না?"

"বলে দিন আনতে। ওয়ার্কশপে বসে খেয়ে নেব," বলে, উঠে দাঁড়ালেন দীপকাকু।

নিতাইকে অর্ডার করতে হল না, চা আনতে বেরিয়ে যাচ্ছিল, ঝিনুক ইশারায় জানাল, সে চা খায় না। তারপর অনুসরণ করল দীপকাকুদের।

ওয়ার্কশপটা বেশ বড়। তুলনায় অফিস খুবই ছোট। দু'টো রুমেই এসি আছে। ওয়ার্কশপ ভর্তি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি। এর মধ্যে কম্পিউটারের মনিটারটাই ঝিনুকের চেনা। ঘরটা দেখে ঝিনুকের মনে হচ্ছে, এখানে অনায়াসে রোবট তৈরি করা যায়। একটা বড়সড় টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন দেবাংশুবাবু। বললেন, "অফিসে ঢুকে ব্যাগটা এখানে নিয়ে এসে রেখেছিলাম।"

"তখনই খুলে দেখেছিলেন কি?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

"না। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক পর। ব্যাগ এখানে রেখে অফিসের টেবিলে যাই, চারটে মেল করি। আর কিছু পেপারওয়ার্ক। হাত ফাঁকা করে ব্যাগটা খুলতে আসি।"

"ইন দি মিন টাইম এই ঘরে কে-কে ঢুকেছিল?" দীপকাকুর পরের প্রশ্ন।

দেবাংশু সেনগুপ্ত বললেন, "ঢুকলে, আমার দু'জন স্টাফই ঢুকবে। দরজা খোলাই ছিল। ওদের মানাও করিনি ঘরে যেতে।"

"ওয়ার্কশপে ঢোকার কি একটাই এনট্রান্স?"

"হ্যাঁ। বাকি তিনটে দেওয়াল সিল্ড। দেওয়ালের উপরে অন্য অফিস আছে।"

সেনগুপ্তবাবুর বলা শেষ হতে, দীপকাকু এগিয়ে গেলেন দেওয়ালের দিকে। চোখ বুলিয়ে হাঁটতে লাগলেন। যে দেওয়ালে স্প্লিট এসি লাগানো, সেখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে ফের শুরু করলেন হাঁটা। ট্রেতে দু'কাপ চা আর কোল্ড ড্রিঙ্ক নিয়ে ঢুকল নিতাই। ঠান্ডাটা নিশ্চয়ই ঝিনুকের জন্য।

দীপকাকু চায়ের কাপ তুলে নিয়ে সেনগুপ্তবাবুকে বললেন, "আপনি একটু বাইরে থাকুন। আপনার এই স্টাফটিকে আমি ক'টা কথা জিজ্ঞেস করব।"

"ওয়েল," বলে নিজের চায়ের কাপ নিয়ে দরজার দিকে হেঁটে গেলেন দেবাংশু সেনগুপ্ত। ঝিনুক কোল্ড ড্রিঙ্ক তুলে নিল। নিতাই ট্রেটা টেবিলে রেখে মাথা নিচু করে হাতে হাত জড়িয়ে এমন ভঙ্গিতে দীপকাকুর সামনে দাঁড়াল, যেন এর আগে বহুবার পুলিশ বা গোয়েন্দার জেরার উত্তর দিয়েছে।

pathagar.net

boierpathshala.blogspot.com

দীপকাকু চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছেন। চায়ে চুমুক দিতে-দিতে নিতাইকে তাঁর প্রথম প্রশ্ন, "আমরা কেন এসেছি, তুমি জানো তো?"

নিতাই ঘাড় কাত করল। অর্থাৎ, জানে। দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "যখন জানা গেল ব্যাগ থেকে সব কিছু চুরি হয়ে গিয়েছে, তুমি তখন কোথায় ছিলে?"

"অফিসেই ছিলাম স্যার। একটা পার্সেল প্যাক করছিলাম। হঠাৎ শুনি ওয়ার্কশপ থেকে দাদাবাবুর গলা, 'নিতাই' বলে ডেকে উঠলেন। ঠিক ডাক নয়, হা-হুতাশের মতো। দৌড়ে গেলাম ওয়ার্কশপে। দেখি, সুটকেস খোলা, একগাদা কাগজ, দাদাবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন।"

"সুটকেসে কী ছিল তুমি জানতে?"

"না, নতুন ব্যাগ নিয়ে অফিসে ঢুকেছেন দেখেছিলাম। একবার জিজ্ঞেসও করেছিলাম, 'বাইরে থেকে কিনলেন?' "

"তার মানে, তুমি জানতে দাদাবাবু সিঙ্গাপুর গিয়েছেন?"

"কেন জানব না! আমিই ট্রাভেল এজেন্সি থেকে টিকিট এনে দিই প্রতিবার।"

"এবার কোন কাজে গিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে তোমার ধারণা আছে?"

"না। যন্ত্রপাতি কিনতে যান এটুকু জানি। এর বেশি আমার জানার দরকারও নেই, ইচ্ছেও নেই।"

দীপকাকুর চা শেষ হল। টেবিলে কাপ নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যখন এসে দেখলে দাদাবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন, তথাগত কোথায় ছিল?"

"তথাগতদা সিগারেট খেতে গিয়েছিল বাইরে। আমি ঢোকার একটু পরে ঢুকল ওয়ার্কশপে।"

"তথাগতর সঙ্গে দাদাবাবুর সম্পর্ক কেমন?"

"ভাল। তথাগতদা দাদাবাবুকে গুরু মানে। কখনও মুখে-মুখে কথা বলে না।"

"তুমি বলো?"

"বলি। যখন দেখি দাদাবাবু আমাকে কোনও কাজের কথা বলতে ভুলে গিয়েছেন, অথচ বলছেন, আমি বলেছি। তখনই খটাখটি লাগে।"

দীপকাকুর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। বললেন, "এবার তোমাকে একটা অন্য প্রশ্ন করি। কলকাতায় সবচেয়ে ভাল চাবি কোথায় তৈরি করে বলতে পার?"

এই প্রথম একটু চমকাল নিতাই। বলল, "কেন স্যার? আপনি কি ভাবছেন আমি সুটকেসের ডুপ্লিকেট চাবি..."

কথা কেটে দীপকাকু বললেন, "তুমি সুটকেসটা ওই দিনই প্রথম দেখেছ, চাবি হাতে পাওয়া তো দূরের কথা। আমি একটা দরকারে জানতে চাইছি, কোথায় ভাল চাবি তৈরি করা যায়? তোমরা তো লোহালক্কড়ের মার্কেটে ঘোরাঘুরি করো।"

একটা যেন নিশ্চিন্ত হল নিতাই। বলল, "চাঁদনি মার্কেটে কিছু ছোটখাটো দোকান আছে। শুনেছি, ভালই কাজ করে। আমি কখনও করাইনি।"

"ঠিক আছে। এবার তুমি যেতে পার, তথাগতকে পাঠিয়ে দাও।"

দীপকাকুর নির্দেশ শুনে ঘাড় হেলাল নিতাই, আচরণে আগের সেই এনার্জি নেই। একটু যেন ঝিমিয়ে পড়ে হেঁটে যাচ্ছে দরজার দিকে।

ঝিনুক জিন্সের পকেট থেকে ছোট নোটবুকটা বের করে ইনভেস্টিগেশনের পয়েন্টগুলো লিখতে থাকল। দীপকাকুর সঙ্গে কাজ করতে গেলে এটা তার অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কখন হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসবেন, এতক্ষণ যা যা দেখলে, তাতে তোমার কী মনে হচ্ছে বলো? প্রশ্নটা দু'দিন পরেও আসতে পারে। ঝিনুককে সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয়।

ঘরে ঢুকলেন তথাগত। থতমত ভাবটা এখনও ওঁর কাটেনি। হেঁটে আসছেন খুব ধীর পায়ে। যেন বাঘের খাঁচায় ঢুকেছেন। দীপকাকুর চেহারায় কিন্তু বাঘের কোনও আভাসই নেই। তবে যখন কাজের মধ্যে থাকেন, ব্যক্তিত্বটা বদলে যায়।

তথাগত সামনে দাঁড়াতে দীপকাকু প্রশ্ন করলেন, "কতদিন কাজ করছেন এখানে?"

"তিন বছরের একটু বেশি।"

"অন্য কোথাও চাকরির চেষ্টা করছেন না? আমাকে নির্ভয়ে বলতে পারেন। দেবাংশুবাবুকে বলব না।"

"না স্যার, ট্রাই করিনি। দাদার কাছে ভালই আছি। অনেক কিছু শিখছি। এভাবে কেউ শেখাবে না।"

"ভবিষ্যতে কী পরিকল্পনা আছে? দাদার মতো একটা কোম্পানি খোলার?"

"এখনও সেরকম কিছু ঠিক করিনি।"

"দাদা কী কারণে সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন আপনি জানেন?"

"জানি। কাজের ব্যাপারে দাদা সব কথাই বলেন আমাকে।"

"তার মানে দেবাংশুবাবু কোন কোম্পানির কাজের বরাত পেয়েছিলেন, তাও জানেন?"

"হ্যাঁ, 'গ্রেট বাইট' বিস্কুট কোম্পানির।"

"কত টাকার কাজ। সেটা কি জানেন?"

"কোম্পানির টাকাপয়সার ব্যাপারে আমি খোঁজ রাখি না। টেকনিক্যাল কাজ ছাড়া দাদা আর কোনও ব্যাপারে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন না। আমারও কোনও ইন্টারেস্ট নেই।"

"যে কাজের অর্ডার আপনার দাদা নিয়েছিলেন, সেটা করার মতো দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার আপনার জানা কেউ আছে কি?"

"না। দাদা ইলেকট্রনিক্সের যে লাইন ধরে কাজ করেন, সেরকম ইঞ্জিনিয়ার কলকাতায় খুব কম। যে ক'জন আছে, দাদার চেয়ে তারা শতমাইল পিছিয়ে।"

উত্তরটা পাওয়ার পর দীপকাকু থামলেন। কী একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "এবার আপনার ফ্যামিলি সম্বন্ধে কিছু বলুন। যদি মনে করেন এটা আপনার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, না-ও বলতে পারেন।"

তথাগত বললেন, "ব্যক্তিগত কিছু নেই। দাদা সবই জানেন। শোভাবাজারে শরিকি বাড়িতে থাকি আমরা। বাবা মারা গিয়েছেন। আমি, মা। এক বোন, কলেজে পড়ে।"

"আর্নিং সোর্স?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

তথাগত বললেন, "বাবার অফিস থেকে মা'র নামে আসা পেনশন। আর আমি এখান থেকে যা পাই।"

"এবার আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন। দেবাংশুবাবুর পার্সোনাল কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড কি আপনি জানেন?"

"জানি। দাদা আমার কাছে কিছুই গোপন করেন না।"

"ঠিক আছে, এবার আপনি আসতে পারেন। দেবাংশুবাবুকে পাঠিয়ে দিন।"

দীপকাকুর নির্দেশ শুনে, তথাগত ঘুরে গিয়ে হাঁটা দিলেন। লোকটার লুক বোকা-বোকা হলে কী হবে, উত্তরগুলো দিলেন স্মার্টভাবে। ঝিনুক জিজ্ঞাসাবাদের শেষ অংশ তড়িঘড়ি নোট করছিল। দীপকাকু বলে উঠলেন, "কেসটা নির্ভেজাল। আমাকে ফাঁসানোর জন্য সাজানো হয়নি।"

ঝিনুকের মনে হল দীপকাকুর বুঝি একটু বেশিই অহঙ্কার হয়ে গিয়েছে, তাই ভেবে ফেলছেন ওঁর রেপুটেশন নষ্ট করতে কেউ উঠেপড়ে লেগেছে। কথাটা ঘুরিয়ে তুলল ঝিনুক, "আচ্ছা, আপনি কেন ভাবছেন, ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে আপনাকে? কাদের হিংসার পাত্র হয়েছেন আপনি?"

দীপকাকু বললেন, "হিংসা নয় ঝিনুক, প্রতিহিংসা। তুমি তো সব কেসে আমার সঙ্গে থাকো না। অনেক উচ্চপদস্থ খারাপ লোকের স্বার্থে ঘা দিয়েছি আমি। তারা তো আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করবেই। এই চুরিটা এতই ফাঁকফোকরহীন, আমার মনে হচ্ছিল বুঝি কেউ আমার বুদ্ধির দৌড় পরীক্ষা করার জন্য কেসটা পাঠিয়েছে।"

"আর এখন কী করে বুঝছেন কেসটা জেনুইন?"

প্রশ্নের উত্তর পেল না ঝিনুক। ঘরে ঢুকে এসেছেন দেবাংশুবাবু।

boierpathshala.blogspot.com

একটা প্লাস্টিকের টুল টেনে এনে দীপকাকুর সামনে বসলেন। গা থেকে সিগারেটের গন্ধ ভেসে আসছে। খেতে গিয়েছিলেন বাইরে। সেই জন্যই দেরি হল আসতে।

ঝিনুক দাঁড়িয়েই ছিল। একটু দূরে একটা চেয়ার আছে, বসতে ইচ্ছে করছিল না। দেবাংশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকুকে, "ওদের সঙ্গে কথা বলে কী মনে হল আপনার?"

দীপকাকু বললেন, "এমনই ঠিকই আছে। দু'জনেই বিশ্বাসী মনে হল। আপনাকে যথেষ্ট রেসপেক্ট করে। এখন দেখা যাক, তদন্ত যত এগোবে, স্পষ্ট হবে ওদের রূপ। আচ্ছা, আপনি বোধ হয় চুরির পর থানায় কোনও ডায়েরি করেননি, না?"

"না, করিনি। করে কী হবে! চুরি যে হয়েছে, সেটাই প্রমাণ করতে পারব না।"

"তবু একটা এফ আই আর করে রাখুন। ডায়েরি নেওয়ার সময় পুলিশ প্রমাণ চায় না। আপনার করা ডায়েরি আমার তদন্তে সাহায্য করবে।"

"কিন্তু কমপ্লেনটা করব কোন থানায়? চুরিটা বাড়িতে হয়েছে, নাকি অফিসে বা অন্য কোথাও, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।"

"আপনি অফিস আসেন কিসে?"

"নিজের গাড়িতে। আমিই ড্রাইভ করি।"

"ব্যাগটা নিয়ে যেদিন অফিসে এসেছিলেন, রাস্তায় অন্তত পনেরো মিনিটের জন্য গাড়ি দাঁড় করিয়ে কোথাও গিয়েছিলেন?"

"না। বাড়ি থেকে সোজা অফিস। কোথাও গাড়ি রাখিনি।"

"আপনার বাড়িটা যেন কোথায়?"

"যাদবপুরে। সেন্ট্রাল পার্কের একটা কমপ্লেক্সের দোতলার ফ্ল্যাটে থাকি আমি।"

"আপনি যাদবপুর থানায় এফ আই আর করুন।"

সামান্য উদ্বেগসহ দেবাংশুবাবু বললেন, "চুরি হয়েছে পাঁচদিন হয়ে গেল। পুলিশ যদি বলে, এতদিন পরে এলেন কেন?"

"বলবেন, এই ক'দিন নিজের ক্ষমতামতো চোর ধরার চেষ্টা করেছি। আন্দাজ করছিলাম, চোর আমার ঘনিষ্ঠ কেউ। তাকে সামাজিকভাবে অপদস্থ করতে চাইনি। আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তাই আপনাদের কাছে এসেছি। এতেও যদি থানা ডায়েরি নিতে না চায়, অফিসারের সঙ্গে ফোনে আমায় কথা বলিয়ে নেবেন।"

দীপকাকুর কথায় ভরসা পেলেন দেবাংশুবাবু। বললেন, "ওকে, তা হলে তো আর কোনও প্রবলেমই রইল না।"

উঠে দাঁড়ালেন দীপকাকু। বললেন, "চলুন, অফিসঘরে যাই। আপনি আমাকে তিনজনের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর দেবেন।"

"কোন তিনজনের?" জিজ্ঞেস করলেন দেবাংশুবাবু।

দরজার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে দীপকাকু বলতে লাগলেন, "আপনার দুই কম্পিটিটর ইঞ্জিনিয়ারের, আর গ্রেট বাইট কোম্পানির মালিকের। আর-একটা জিনিস আমার লাগবে, যে ব্যাগ থেকে আপনার জিনিসপত্র খোয়া গিয়েছে, তার একটা চাবি।"

"সব এখনই দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে," বললেন দেবাংশু সেনগুপ্ত।

ঝিনুকরা ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে দেবাংশুবাবুর কেবিনে ঢুকলেন। চেয়ারে বসে দীপকাকু বললেন, "ঠিকানা আর চাবি নিয়ে আমি ইনভেস্টিগেশনে বেরিয়ে যাব। আপনি যাবেন থানায়। কমপ্লেন লেখানোর পর ফোনে আমায় এফ আই আর নম্বরটা বলবেন।"

এত দ্রুত নির্দেশগুলো দিচ্ছেন দীপকাকু, দেবাংশুবাবু ঠিক যেন ফলো করে উঠতে পারছেন না। চেয়ারে বসে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন দীপকাকুর দিকে, অপেক্ষা করছেন আরও কোনও নির্দেশের।

দীপকাকুর গলায় ধমকের সুর এসে গেল, "কী হল, দিন জিনিসগুলো!"

শশব্যস্ত হয়ে পড়লেন দেবাংশুবাবু। বললেন, "হ্যাঁ, এই তো দিই।"

কাগজ, পেন টেনে নিয়ে নাম, ঠিকানা লিখতে শুরু করলেন দেবাংশুবাবু। ঝিনুকের মন ফিরে গেল একটু আগের জিজ্ঞাসাবাদের সেশনে। সেখানে এমন কিছু প্রশ্ন করেছেন দীপকাকু, যার কোনও কারণ খুঁজে পায়নি ঝিনুক। চান্স পেলেই প্রশ্নগুলো করার অর্থ দীপকাকুর থেকে জেনে নিতে হবে।

দুপুর একটা। ঝিনুক, দীপকাকু এখন ধর্মতলার রেস্তরাঁয়। দীপকাকু মেনু দেখে খাবার অর্ডার দিয়েছেন। বিরিয়ানি, চিকেন চাপ, ফিরনি... এলাহি সব আইটেম। অর্ডার দেওয়ার ধরন দেখে ঝিনুকের মনে হচ্ছিল, দেবাংশু সেনগুপ্তর কেসটা আর ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই দীপকাকু সল্‌ভ করে ফেলবেন। তাই বেশ খোশমেজাজে আছেন। বাস্তবে তা কিন্তু নয়। তদন্ত মোটেই এগোয়নি। দেবাংশুবাবুর অফিস থেকে বেরিয়ে বাইক চেপে ঝিনুকরা এসেছিল চাঁদনি মার্কেটে। দেবাংশুবাবুর স্টাফ নিতাইয়ের কথামতো দীপকাকু চাবি তৈরির দোকানের খোঁজ করলেন। পাওয়া গেল গোটাপাঁচেক দোকান। দেবাংশুবাবুর থেকে নেওয়া ব্যাগের চাবিটা সবক'টা দোকানদারকে দেখিয়ে বলা হল ডুপ্লিকেট তৈরি করতে। পাঁচজনই জানাল, তারা পারবে না। খুবই ক্রিটিকাল নাকি চাবি। এটা তৈরি করতে গেলে আরও যন্ত্রপাতি লাগবে। দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "এই চাবি কলকাতায় কে তৈরি করতে পারবে?"

দোকানদারদের মধ্যে একজন বলল, "মল্লিকবাজারে মিস্টার আফাং-এর কাছে চলে যান। উনি চাবি তৈরির ব্যাপারে কলকাতায় এক নম্বর।"

দীপকাকু মিস্টার আফাংয়ের ঠিকানা লিখে নিয়ে পকেটে রেখেছিলেন। ঝিনুক ভেবেছিল এবার বুঝি মল্লিকবাজারে যাওয়া হবে। বদলে দীপকাকু বললেন, "চলো, লাঞ্চটা সেরে নিই কোনও রেস্তরাঁয়।"

খেতে আসার পথে ঝিনুক একটা কৌতূহল মিটিয়ে নিল, "আফাং নামটা অদ্ভুত। কোথাকার লোক বলুন তো?"

"চায়নার," বলেছিলেন দীপকাকু।

ঝিনুক বিস্মিত হয়ে বলেছিল, "চিনের লোক!"

দীপকাকু বললেন, "এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই তো। আজ থেকে পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে কলকাতায় ভাল টেকনিশিয়ান পেতে গেলে চাইনিজদের কাছেই যেতে হত। যেমন, চাইনিজ ডেন্টিস্টরা ছিলেন। ধীরে-ধীরে টেকনোলজির কদর বুঝল বাঙালি। তাই এখন চারপাশে এত মেশিন সারানোর লোক।"

"আগের সেই চাইনিজ টেকনিশিয়ানরা তা হলে গেলেন কোথায়?" জানতে চেয়েছিল ঝিনুক।

দীপকাকু বললেন, "অনেকেই দেশে ফিরে গিয়েছে। কেউ আবার অনুন্নত অন্য কোনও দেশে। আফাংয়ের মতো এখনও কয়েকজন রয়ে গিয়েছেন কলকাতায়।"

একটা কৌতূহল তখনকার মতো মিটলেও ঝিনুকের মাথায় রয়ে গিয়েছে বেশ কিছু প্রশ্ন। বেয়ারা জল দিয়ে গিয়েছে। খাবার আসতে একটু দেরি হবে, এখন প্রশ্নগুলো করা যায়। দীপকাকু শূন্যে চোখ রেখে কী যেন ভাবছেন। শরীরটা কাঁপছে। টেবিলের তলায় পা দোলাচ্ছেন নিশ্চয়ই। ঝিনুক বলে উঠল, "আমার কয়েকটা জিনিস জানার আছে।"

"বলে ফ্যালো," টেবিলের ওপার থেকে বললেন দীপকাকু।

ঝিনুক বলল, "ব্যাগের মধ্যে থাকা কাগজগুলোকে এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? কী দেখছিলেন খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে?"

"দেখছিলাম, কাগজগুলো কোথাকার। এতে মোটামুটি একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে, কোথায়, কবেনাগাদ ওগুলো ঢোকানো হয়েছে ব্যাগে?"

"কী বুঝলেন কাগজগুলো দেখে?"

বড় একটা শ্বাস ছেড়ে দীপকাকু বললেন, "খুবই বিভ্রান্তিকর। নানাধরনের কাগজ, কলকাতার দর্শনি এবং আটদিনের পুরনো বাংলা, ইংরেজি নিউজ পেপার। সিঙ্গাপুরের টুরিস্ট কোম্পানির ক্যাটালগ, সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স-এর একটা ম্যাগাজিন। একটা এই মাসের বাংলা ম্যাগাজিন। কিছু পিচবোর্ড আর প্লাস্টিক। এর থেকে কোনও সিদ্ধান্তে

boierpathshala.blogspot.com

পৌঁছনো বেশ কঠিন।"

খাবার এসে গেল। ধোঁয়া উঠছে প্লেটে। ঝিনুক এখন ওদিকে মন দেবে না। সে পরের প্রশ্নে গেল, "কলকাতায় চাবি কোথায় ভাল তৈরি করে আপনি নিশ্চয়ই জানেন। তাও কেন নিতাইকে প্রশ্নটা করলেন?"

"ওর রিঅ্যাকশানটা দেখার জন্য। সম্প্রতি ও যদি ব্যাগটার আসল চাবি থেকে নকল করিয়ে থাকে, এক্সপ্রেশনে ফুটে উঠত অপরাধের ছায়া।"

"উঠেছে কি?" জানতে চাইল ঝিনুক।

হতাশ স্বরে দীপকাকু বললেন, "না। হয়তো ভাল অভিনেতা।"

ঝিনুক জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি শিওর, চাবি নকল করে ব্যাগটা খোলা হয়েছে? আসল চাবি দিয়েও তো খোলা হতে পারে।"

দীপকাকু খাওয়া শুরু করলেন। মুখ এখন ব্যস্ত। তাই শুধু ঘাড় নাড়লেন। মানেটা বুঝতে পারল ঝিনুক। দু'টো ঘটনাই সম্ভব। ঝিনুক খাওয়া শুরু করল। মুখ ফাঁকা হতে দীপকাকু বললেন, "চাঁদনি মার্কেটে চাবি তৈরির দোকান আছে, আমি জানতাম। আফাংয়ের নামটা আমার উপরি পাওনা।"

খাওয়ার ফাঁকে ঝিনুক প্রশ্ন করল, "তথাগতবাবুকে কেন জিজ্ঞেস করলেন, দেবাংশুবাবুর পার্সোনাল কম্পিউটারের পাসওয়ার্ড জানেন কি না?"

"দেখছিলাম, লোকটা মালিকের কতটা ঘনিষ্ঠ। পাসওয়ার্ড জানে যখন, খুবই কাছের লোক। অথচ একটা ব্যাপার গোপন করে গেল।"

"কোন ব্যাপারটা?"

"মেশিন আপগ্রেডেশনের জন্য কত টাকার এগ্রিমেন্ট হয়েছে, তথাগত জানে। বলল না।"

"কীভাবে জানল?"

"এরকম বড় অ্যামাউন্টের এগ্রিমেন্ট পেপার, দেবাংশুবাবু অবশ্যই নিজের কম্পিউটারে কপি করে সেভ করে রেখেছেন। স্বাভাবিক কৌতূহলে তথাগত সেটা দেখেছে, পাসওয়ার্ড সে জানে। অথচ বলছে, কত টাকার অর্ডার জানে না। এই পয়েন্টটা কেন এড়িয়ে যেতে চাইছে, দেখতে হবে।"

ঝিনুকও খেতে-খেতে ভাবতে থাকল, কেন তথাগতবাবু টাকার অ্যামাউন্টটা জানেন না, বললেন? নিজেকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখার জন্য? তা হলে উনিই....না, এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। দীপকাকু বলেন, "তদন্ত করতে গিয়ে কেসে জড়িত সকলকে সন্দেহ করা যেমন উচিত, তেমনই অপরাধী শনাক্ত করার আগে তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট সাক্ষ্য-প্রমাণও হাতে রাখা দরকার।" তাই এখনই অপরাধী নিয়ে ভেবে লাভ নেই। চুরি কীভাবে হয়েছে, সেটাই এখন পর্যন্ত বোঝা গেল না। তার চেয়ে দীপকাকুর তদন্তের গতিপ্রকৃতির উপর আপাতত লক্ষ রাখা যাক। ফের প্রশ্নে গেল ঝিনুক, "চুরির এতদিন পর আপনি কেন দেবাংশুবাবুকে পুলিশে ডায়েরি করতে বললেন? কেসটার মধ্যে এবার পুলিশ ঢুকে পড়বে। চোর ধরবেন আপনি। পুলিশ কিছুটা ক্রেডিট নিয়ে চলে যাবে।"

মিটিমিটি হাসছেন দীপকাকু। বললেন, "কেন ডায়েরি করতে বললাম, একটু পরেই বুঝতে পারবে।"

"আমার লাস্ট এবং ছোট্ট প্রশ্ন, এত হেভি লাঞ্চ এখন আমরা নিলাম কেন? আজকের মতো কাজ কি শেষ? এবার কি যে-যার বাড়ি ফিরে রেস্ট নেব?" জানতে চাইল ঝিনুক।

দীপকাকু খেতে-খেতে মাথা নাড়লেন। গ্রাস শেষ করে বললেন, "এর পরই তো কঠিন কাজে নামব। তাই ভাল করে খেয়েদেয়ে নিলাম। পেটে ভাল খাবার থাকলে ব্রেন দারুণ কাজ করে।"

কথা শেষ হতেই দীপকাকুর সেল ফোন বেজে উঠল। বাঁ হাতে বুক পকেট থেকে ফোনটা বের করলেন দীপকাকু। স্ক্রিনে চোখ বুলিয়ে কানে নিলেন সেটটা। বললেন, "হ্যাঁ, বলুন।"

ও প্রান্তের কথা শুনে নিয়ে দীপকাকু বললেন, "ঠিক আছে। এবার এফ আই আর-এর নম্বরটা বলুন।"

ঝিনুক বুঝতে পারল, ফোনের ওপারে দেবাংশুবাবু। দীপকাকু ডায়েরির নম্বরটা শুনে নিয়ে বললেন, "আপনি এখন অফিসে ফিরে যান। আমি রাতে অথবা কাল সকালে ফোন করব। ইতিমধ্যে যদি কোনও আনএক্সপেক্টেড ঘটনা ঘটে, সঙ্গে-সঙ্গে ফোনে আমায় জানাবেন।"

ফোনের ওপারে দেবাংশুবাবু সম্ভবত জানতে চাইলেন, "কী ধরনের ঘটনার কথা আপনি বলছেন?"

দীপকাকু বললেন, "ওই যে বললাম, অপ্রত্যাশিত কোনও ঘটনা, যা ঘটার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সেরকম কিছু হলেই ফোন করবেন আমাকে।"

ঝিনুক জানে, দীপকাকু ঘটনাটা আন্দাজ করতে পারছেন, পুরোটা ভাঙতে চাইছেন না এখন। দেবাংশুবাবুর ফোন কেটে দীপকাকু কোনও একজনের নম্বর সার্চ করছেন ফোন সেটে। কল টিপে সেটটা এবার কানে নিলেন। ও প্রান্তের লোকটির কাছে দীপকাকুর নম্বর সেভ করা আছে। তাই এ প্রান্তে কথা শুরু হল এক ধাপ লাফিয়ে, "ভালই আছি। শোন, আমাকে একটা হেল্প করতে হবে। তিনজনের নাম আর ফোন নম্বর দিচ্ছি, প্রফেশানটাও বলে দেব, তুই তাদের ফোন করে প্রথমেই বলবি লালবাজার থেকে বলছিস, মানে, সত্যি কথাই বলবি। তারপর জানাবি, যাদবপুর থানায় একটা চুরি সক্রান্ত এফ আই আর জমা হয়েছে। তার তদন্তে তোর এক গোয়েন্দা বন্ধু ইন্টারোগেশনের জন্য যাচ্ছে। তারা যেন বন্ধুটিকে সব রকম সহযোগিতা করে। আমার নামটা অবশ্যই বলে দিবি। যাদবপুর থানার ডায়েরির নম্বরটা তোকে আমি দিচ্ছি। ওরা যদি ক্রস করে, তুই বলতে পারবি। যাদবপুর থানায় যদি ফোন করে, তা হলে তোর কথা মিলে যাবে।"

ঝিনুক এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে, ফোনের ও প্রান্তে কে আছেন। রঞ্জনকাকুর বন্ধু। দীপকাকুর বন্ধু। পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্সের একজন ইনচার্জ। দীপকাকুকে বহু কেসে উনি সাহায্য করেছেন। ঝিনুকের সঙ্গে আলাপ আছে।

দীপকাকু ফোনে তিনজনের নাম এবং বাকি ইনফর্মেশন দিয়ে বললেন, "বুঝতেই তো পারছিস, লালবাজার থেকে ফোন গেলে এরা একটু ঘাবড়াবে। নয়তো আমার মতো প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরকে ওরা পাত্তা না-ই দিতে পারে।"

এর পর ফোনালাপ শেষ হল, হ্যাঁ, হুঁ, দেখা হলে সব বলব, বলে। ফোন অফ করে সেট পকেটে রাখলেন দীপকাকু। দু'জনেরই খাওয়া প্রায় শেষ পর্যায়। বাকিটুকু সদ্গতি করতে-করতে দীপকাকু বললেন, "চলো, গ্রেট বাইট কোম্পানির মালিক বসন্ত আগরওয়ালের সঙ্গে একটু বাতচিত করা যাক।"

গ্রেট বাইট বিস্কুট কোম্পানির অফিস তারাতলার এক প্রান্তে। এলাকাটা বেশ ফাঁকা-ফাঁকা। অফিস এবং কারখানা নিশ্চয়ই একসঙ্গে। কারণ, পাকা দোতলা বিল্ডিংয়ের পিছনেই করোগেটেড শেড দেখা যাচ্ছিল। ঝিনুকরা পাঁচ মিনিট হল অফিসের রিসেপশনে এসেছে। মালিকের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে জানিয়ে দীপকাকু নিজের কার্ড দিয়েছেন রিসেপশনিস্ট মহিলাকে। ভদ্রমহিলা ঝিনুকদের ভিজিটার্স সোফায় বসতে বলে, কার্ড পাঠিয়েছেন ভিতরে। ঝিনুকরা বসে আছে মালিকের ডাকের অপেক্ষায়।

অফিসটা খুব ঝকঝকে-তকতকে। মডার্ন ফার্নিশ করা। কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দীপকাকু চাপা গলায়, "বাঃ," বলার পর বলেছিলেন, "মালিক বেশ পরিপাটি স্বভাবের মনে হচ্ছে।"

অফিস দেখে মালিকের স্বভাব হয়তো আন্দাজ করা যায়। কিন্তু 'পরিপাটি' বলতে ঠিক কী বোঝাতে চাইলেন দীপকাকু, ঝিনুক ধরতে পারেনি। ঘনঘন প্রশ্ন করলে দীপকাকু বিরক্ত হন, তাই জিজ্ঞেসও করা যাচ্ছে না। এখানে পৌঁছনোর আগে দীপকাকু বেহালার একটা পেট্রোল পাম্পে বাইকের জন্য তেল ভরতে ঢুকলেন। তখনও একটা ধোঁয়াশামার্কা কথা বললেন, সেটারও মর্মার্থে যেতে পারেনি ঝিনুক। তেল ভরে দেওয়ার পর পাম্পের ছেলেটিকে কড়কড়ে পাঁচশো টাকার নোট দিলেন। ছেলেটি যখন এগিয়ে গেল ক্যাশ কাউন্টারে, দীপকাকু

boierpathshala.blogspot.com

ঝিনুককে জিজ্ঞেস করলেন, "নোটটা কার দেওয়া বলো তো?"

ঝিনুক ঠোঁট উলটেছিল, অর্থাৎ, কে জানে! সত্যিই তো, সে জানবে কী করে! দীপকাকু বলেছিলেন, "সেই আতঙ্কগ্রস্ত মহিলার! যিনি সব সময় ভাবেন, কেউ তাঁকে মারার চেষ্টা করছে। তোমাদের সামনেই তো উনি একগাদা টাকা দিয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলার খবর নেওয়া হল না। নিশ্চয়ই ভাল আছেন। কোনও দরকার থাকলে, ফোন করতেন। ওঁর টাকা খরচ হচ্ছে দেবাংশুবাবুর কেসে। দেবাংশু সেনগুপ্তর দেওয়া অ্যাডভান্সের চেক এখনও ব্যাঙ্কে ফেলিনি। কেন বলো তো?"

কোয়েশ্চেনটা এতই আনকমন, ঝিনুক ভাবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে বলল, "কেন?"

দীপকাকু বলতে থাকলেন, "অ্যাডভান্স হিসেবে যত টাকার চেক দেবাংশুবাবু আমাকে দিয়েছেন, টোটাল কেসের চার্জ অত হবে না। তখন অ্যাডভান্সের চেকটা ফেরত দিয়ে, এর চেয়ে কম অ্যামাউন্টের চেক অথবা ক্যাশ দিতে বলতে হবে।"

"কেসটা তার মানে খুব তাড়াতাড়ি সল্‌ভড হয়ে যাবে, বলছেন?" খানিকটা নিরাশকণ্ঠে জানতে চেয়েছিল ঝিনুক। এতদিন পর দীপকাকুকে অ্যাসিস্ট করার সুযোগ পেয়েছে, কেসটা চট করে ফুরিয়ে গেলে ভাল লাগে?

বাইকে বসে দীপকাকু গুছিয়ে বলতে শুরু করলেন, "এই কেসটার দু'টো পার্ট। একটা হচ্ছে, চোরাই জিনিস উদ্ধার করা, দুই, চোরকে ধরা। ক্লায়েন্ট অর্থাৎ, দেবাংশুবাবুর চোরের ব্যাপারে কোনও ইন্টারেস্ট নেই। জিনিসগুলো ফেরত পেলেই তাঁর চলবে। আমি শিওর, ওই সব ইলেকট্রনিক পার্টস নির্দিষ্ট একটা গণ্ডির ভিতরে হাতফেরতা হচ্ছে। মানে, অটোমেটেড বিস্কুট ম্যানুফ্যাকচারিং মেশিনের মালিক আর ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে। এই চোরাই জিনিসটা যদি সোনা, হিরে অথবা অন্য কোনও মহার্ঘ্যবস্তু হত, এতক্ষণে বহু হাত ঘুরে চলে যেত নাগালের বাইরে। তাই, দেবাংশুবাবুর জিনিসগুলো পেতে আমার দেরি হবে না। চুরির পদ্ধতি এবং চোরকে ধরতে হবে আমার নিজের আগ্রহে। এই কাজে সময় লাগতে পারে। সেই সময় এবং শ্রমের ফিজ দিতে চাইবেন না দেবাংশুবাবু। জিনিস ফেরত পেলেই ভুলে যাবেন আমাদের। এদিকে আমি আবার এই আশ্চর্য চুরির সমাধান না করে থাকতে পারব না।"

কথাগুলো ধাঁধার মতো লাগছিল ঝিনুকের। এতদিন জানত, চোরাই জিনিস আর চোরের অবস্থান খুব কাছাকাছি। একটার সন্ধান পেলে, অন্যটা নিজে থেকেই চলে আসে। অনেকটা কান টানলে মাথা আসার মতো। দীপকাকু কী করে আন্দাজ করছেন এই কেসে দু'টোর ব্যবধান বিশাল? চোরাই জিনিসগুলো পাওয়ার ব্যাপারে দীপকাকু এতটাই কনফিডেন্ট, যেন গন্ধ পাচ্ছেন ইলেকট্রনিক পার্টস আর ডায়াগ্রামের।

"মিস্টার দীপঙ্কর বাগচী, প্লিজ গো ইনসাইড।"

মহিলা রিসেপশনিস্টের ডাকে ভাবনা থেকে ফিরল ঝিনুক। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। দীপকাকু কিন্তু উঠলেন না। ঘরের কর্নারে রাখা পিতলের টব আর গাছের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কী যেন ভেবে যাচ্ছিলেন। ঝিনুক বলল, "কী হল? ডাকছে আমাদের, চলুন!"

"ও, ডেকেছে বুঝি?" বলে, শশব্যস্ত হয়ে সোফা থেকে উঠে এলেন দীপকাকু। চোখেমুখে অন্যমনস্কতার ঘোর। চেহারাটা একেবারেই এই অফিসের সঙ্গে মানাচ্ছে না। এরকম আপাদমস্তক গোবেচারা টাইপের দেখতে গোয়েন্দাকে এত বড় কোম্পানির মালিক সমীহ করলে হয়!

মালিকের চেম্বারে ঢুকে দেখা গেল, টেবিলের ও প্রান্তে দু'জন বসে আছেন। এদের মধ্যে কে মালিক, সহজেই আন্দাজ করা যাচ্ছে। যিনি বসেছেন টেবিলের মাঝ বরাবর, দামি রিভলভিং চেয়ারে, বসন্ত আগরওয়ালের বয়স পঞ্চাশের হয়তো একটু নীচে। গায়ের রং খুব ফরসা। পানমশলা জাতীয় কিছু চিবোচ্ছেন। পাশের লোকটি সম্ভবত ঘনিষ্ঠ সহচর। দীপকাকুকে বিশেষ আপ্যায়নে মিস্টার আগরওয়াল বললেন, "আইয়ে মিস্টার বাগচী। সরি, আপ লোগো কো থোড়া ওয়েট করনা পড়া। প্লিজ বইঠিয়ে। বইঠিয়ে ম্যাডাম।"

শেষ সম্বোধনে ঝিনুক একটু নার্ভাস ফিল করল। এত বড একটা লোক তাকে ম্যাডাম বলছেন! দীপকাকু বসেছেন। তাড়াতাড়ি পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল ঝিনুক। দীপকাকু কথা শুরু করলেন, "আমি যে আসব, আমার বন্ধু নিশ্চয়ই আপনাকে জানিয়েছে।"

"হ্যাঁ, লালবাজার থেকে ফোন করেছিলেন আপনার ইনস্পেক্টর ফ্রেন্ড। সেইজন্য আমিও আমার এক ল'ইয়ার ফ্রেন্ডকে ডেকে আনলাম," বলে, পাশের লোকটির দিকে হাত দেখালেন আগরওয়াল।

ভদ্রলোক দীপকাকুর দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "আমি সুমিত মালাকার। হাইকোর্টে আছি।"

হ্যান্ডশেক করলেন দীপকাকু। ঝিনুক লক্ষ করল, দীপকাকুর মুখ বেশ থমথমে হয়ে গিয়েছে। লালবাজারের বদলে হাইকোর্ট হাজির করেছেন বিস্কুট কোম্পানির মালিক। দীপকাকুকে সতর্ক হয়ে কথা চালাতে হবে। আগরওয়াল বলে উঠলেন, "বলুন, আপনাকে কী ধরনের হেল্প করতে পারি আমি?"

দীপকাকু বললেন, "আমার বন্ধু আপনাকে জানিয়েছে, একটা চুরির কেসে আমি আপনার কাছে আসছি। কী চুরি গিয়েছে, সেটা বলেনি। আপনি কি আন্দাজ করতে পারছেন, কোন চুরির ঘটনায় আমাকে আপনার সাহায্য নিতে হচ্ছে?"

দীপকাকুর প্রশ্নটা যথেষ্ট প্যাঁচালো। অসতর্ক হয়ে উত্তর দিলেই ফাঁদে পড়ে যাবেন আগরওয়াল। কিন্তু তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, ওঁর মুখে ফুটে উঠেছে সত্যিকারের অবাক ভাব। বললেন, "নেহি। রিসেন্টলি কোই চোরি কা ইনসিডেন্ট মেরা অগল-বগল মে নেহি হুয়া হ্যায়।"

প্রসঙ্গ থেকে সরে গিয়ে দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, আমায় একটা কথা বলুন তো, আপনার মেশিনের আপগ্রেডেশনের জন্য কোনও ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে এগ্রিমেন্ট করেছিলেন?"

"হাঁ, কিয়া হ্যায়, মিস্টার সেনগুপ্তর সঙ্গে।"

"ওঁকেই কেন কন্ট্রাক্টটা দিলেন? কলকাতায় তো আরও ইঞ্জিনিয়ার ছিল?"

"কাঁহা হ্যায় আচ্ছা ইঞ্জিনায়ার? ওই সেনগুপ্তবাবুই আছেন ক্যালকাটায়। বাকি দো আদমি হ্যায়, সেনগুপ্ত য্যায়সা নেহি। সেনগুপ্ত বহুত জিনিয়াস আছেন।"

কোনও অবাঙালির মুখে হিন্দি মেশানো বাংলা শুনতে ঝিনুকের বেশ ভালই লাগে। কিন্তু এখন শুধু ভাল লাগলে চলবে না, প্রতিটি কথার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য লক্ষ রাখতে হবে। দীপকাকু যান পরের কথায়। "বাকি যে দু'জন ইঞ্জিনিয়ারের কথা আপনি বলছেন, তাদের দিয়ে কখনও কাজ করিয়েছেন?"

"কিয়া থা একবার। সমীরণ দাস কো বুলানা পড়া। ওই সময় দেবাংশুবাবু আউট অফ স্টেশন ছিলেন।"

"সূর্য রায়কে কোনওদিন দরকার পড়েনি? আলাপ আছে?"

"আছে।"

দীপকাকু আর-এক ইঞ্জিনিয়ারের নাম করলেন। ঝিনুক লক্ষ করছে, কীরকম ঠান্ডা মাথায় দীপকাকু স্টেপ বাই স্টেপ কোয়েশ্চেনে আগরওয়ালকে কোণঠাসা করছেন। উকিলবন্ধুটি এখনও কথা বলতে পারেননি। কারণ, দীপকাকু একটাও বেআইনি কথা বলেননি এ পর্যন্ত। আগরওয়াল বললেন, "সূর্য রায়ের সঙ্গে ভেট হয়েছিল ট্রেড ফেয়ারে। কার্ড দিয়ে আলাপ করেছিলেন। মুখটা এখন আর মনে নেই।"

উত্তর দেওয়ার পর আগরওয়াল বললেন, "আপনাদের জন্য চা বলব, না ঠান্ডা?"

"নো থ্যাঙ্কস," বলে দীপকাকু নড়েচড়ে সোজা হলেন। বললেন, "এবার আপনাকে আসল কথাটা বলি, দেবাংশুবাবুকে যে অর্ডারটা আপনি দিয়েছিলেন, তার ডায়াগ্রাম, পার্টস সব চুরি গিয়েছে ওঁর ব্যাগ থেকে।"

"ও মাই গড!" বলে, প্রায় আঁতকে উঠলেন আগরওয়াল। তারপর বললেন, "হেভি লস হুল সেনগুপ্তবাবুর। আমারও ভি হুল। আপগ্রেডেশনের এখন কী হুবে?"

দীপকাকু বললেন, "একটা কোয়েশ্চেন করব? শুনতে হয়তো ভাল

boierpathshala.blogspot.com

লাগবে না আপনার....”

“তবু করুন। তা হলে বোঝা যাবে, আপনার এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য,” এটা বললেন উকিলবাবু। অনেকক্ষণ পরে কিছু বললেন। এতক্ষণ অবজার্ভ করে যাচ্ছিলেন পরিস্থিতি।

দীপকাকু বললেন, “কথাটা হল, আমরা ধরেই নিচ্ছি চুরি যে লোকই করে থাকুক, জিনিসগুলো কোনও না-কোনও ইঞ্জিনিয়ারের হাতে পড়বে। সেই ইঞ্জিনিয়ার যদি তার টেকনোলজি বিক্রি করতে আসে এই কোম্পানিতে, আগরওয়ালবাবু কি কিনবেন?”

“নিশ্চয়ই কিনব। যদি সেনগুপ্তবাবুর চেয়ে সস্তায় পাই। তবে এক মাসের মধ্যে কিনব না। সেনগুপ্তবাবুর সঙ্গে আমার ওয়ান মান্থের এগ্রিমেন্ট আছে। এই টাইমের মধ্যে কাজটা উনি করে দেবেন। লিখে দিয়েছেন,” বললেন বসন্ত আগরওয়াল।

দীপকাকু বললেন, “আপনাকে একটা রিকোয়েস্ট করব। ওই টেকনোলজি কেউ যদি আপনার কাছে বেচতে আসে, আমাকে কাইন্ডলি একবার ইনফর্ম করবেন।”

উকিলবাবু বলে উঠলেন, “করতে উনি কিন্তু বাধ্য নন। অর্ডারটা থানা থেকে আসছে না। সরকারি নির্দেশ নয়।”

“জানি। তাই তো বললাম, রিকোয়েস্ট। তবে এটাও বলে রাখি, চোরাই জিনিস যদি গ্রেট বাইটের কারখানা থেকে উদ্ধার হয়, তা হলে কিন্তু সত্যিই পুলিশি জালে জড়িয়ে যাবেন মিস্টার আগরওয়াল। এখন আপনারা ভেবে দেখুন, কী করবেন?”

দাবা খেলায় বাবাকে ঠিক এই ভাবেই কিস্তি দেন দীপকাকু। তারপর মুখটা এমন নির্বিকার করে রাখেন, যেন হারছেন উনিই। ওই ভঙ্গিতেই বসে আছেন আপাতত। উকিলবাবু এবং আগরওয়াল পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। নিজেদের মধ্যে চাপাগলায় কিছু কথাবার্তাও সারা হল। উকিলবাবু তাকালেন দীপকাকুর দিকে। বললেন, “ওকে, আমরা ইললিগালি কোনও টেকনোলজি কিনব না। ডিল হবে প্রপার পেপার্স অ্যান্ড বিলের এগেনস্টে। তবে কী কিনছি, তা কিন্তু আপনাকে আমরা জানাতে পারব না।”

দীপকাকুর মুখ দেখে বোঝা গেল বেশ হতাশ হলেন। বড় করে শ্বাস ফেলে বললেন, “যতটা সাহায্যর প্রত্যাশা নিয়ে এসেছিলাম, ততখানি পাওয়া গেল না। আমি আসাতে আপনারাই বরং উপকৃত হলেন। টেকনোলজিটা কিনবেন আটঘাট বেঁধে।”

উকিলবাবুর গলায় এবার সহানুভূতির সুর, “কী করা যাবে বলুন মিস্টার বাগচী, আমার ক্লায়েন্ট যদি টেকনোলজিটা না কেনেন, অন্য কোনও কোম্পানি কিনে নিয়ে ব্যবসায় এগিয়ে যাবে। বুঝতেই পারছেন, কম্পিটিশনের যুগ।”

চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন দীপকাকু। ঝিনুকও দাঁড়িয়ে পড়ল। দীপকাকু হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডশেক করলেন দু'জনের সঙ্গে। বললেন, “থ্যাঙ্কস টু বোথ অফ ইউ। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি আবার আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে।”

“অ্যাট লিস্ট এই কেসে যেন না হয়,” হাসতে-হাসতে বললেন আগরওয়াল।

হাসিটা কেবিনের বাইরে আসার পরেও ঝিনুকের কানে বাজতে থাকল। যথেষ্ট বিদ্রুপ ছিল ওই হাসিতে। দীপকাকু সেটা খেয়াল করেছিলেন কি না, বোঝা গেল না।

গ্রেট বাইট কোম্পানির লাউঞ্জে রাখা বাইকে দীপকাকু যখন বসতে যাচ্ছেন, ঝিনুক বলল, “আপনার কথামতো মালিকের স্বভাবটা কিন্তু মিলে গেল।”

সবিস্ময়ে দীপকাকু জানতে চাইলেন, “কীরকম?”

“ওই যে বলেছিলেন, 'পরিপাটি'। সত্যিই তাই, জেরার মুখোমুখি হওয়ার আগে উকিল ডেকে নিয়েছেন।”

দীপকাকু মিটিমিটি হাসছেন। ঝিনুক হাসিটার মানে করতে পারল না। ধরে নিল নিশ্চয়ই বাহবা দেওয়ার হাসি।

তারাতলা থেকে লেকটাউনে এসে পৌঁছলেন ঝিনুকরা। এখানে ইঞ্জিনিয়ার সমীরণ দাসের বাড়ি এবং অফিস একসঙ্গে। সমীরণবাবুর ঠিকানার কাছাকাছি এসে দীপকাকু একটা চা দোকানের সামনে বাইক থামালেন। এতটা রাস্তা ড্রাইভ করে ক্লান্ত হয়েছেন যথেষ্ট। দোকানিকে চা দিতে বলে, সমীরণ দাসের বাড়িটা কোথায়, জিজ্ঞেস করলেন। দোকানি আঙুল তুলে একটা দোতলা বাড়ি দেখিয়ে দিল।

দোকানি দু'জনকেই চা দিয়েছে। অন্য সময় ঝিনুক চা খায় না, এখন খাচ্ছে। এতক্ষণ বাইকের পিছনে বসে থাকতে-থাকতে ঝিমুনি লেগে গিয়েছিল। রাস্তাতেই দেখল, দুপুর ঢলে গেল বিকেলের দিকে। প্রচুর লোকজন দেখা হল আসার পথে। কেউ খুব ব্যস্ত, কারও হাঁটায় আবার বেড়ানোর ছন্দ। ঝিনুকদের মতো জটিল রহস্য সমাধানে ব্যস্ত হয়তো কেউই নয়। চোর এবং চোরাই জিনিস এখনও ঝিনুকদের থেকে অনেক দূরে। অথচ দীপকাকু এমন ভাব করছিলেন, চুরির জিনিসপত্র বুঝি আগরওয়ালের ফ্যাক্টরিতে লাগানো হয়ে গিয়েছে।

চা শেষ করে সিগারেট ধরালেন দীপকাকু। দোকানিকে পয়সা মেটালেন। ঝিনুককে বললেন, “চলো, দেখা যাক এই লোকটা কীরকম।”

ফের বাইকে চেপে সমীরণ দাসের বাড়ির সামনে এলেন ঝিনুকরা। গেটের থামে নেমপ্লেট। ঝিনুক বাইক থেকে নেমে গেট খুলে দরজার সামনে গেল। বেল টিপল। ভিতর থেকে মহিলাকণ্ঠ ভেসে এল, “খুলছি।”

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। খুলে গেল দরজা। এক ভদ্রমহিলা এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, “লালবাজার থেকে এসেছেন আপনারা?”

দীপকাকু বেমালুম “হ্যাঁ” বলে দিলেন। মহিলা সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইলেন ঝিনুকের দিকে, ভাবলেন হয়তো, এইটুকু মেয়ের কী করে পুলিশে চাকরি পাওয়া সম্ভব?

দীপকাকু তাড়া দিলেন, “আছেন, সমীরণবাবু?”

“হ্যাঁ, আছেন। আসুন।”

মহিলা সম্ভবত সমীরণবাবুর স্ত্রী। ওঁকে অনুসরণ করে দরজা পেরোতেই ভদ্রমহিলা ডানহাতি ঘরটা দেখালেন, “ওই যে, কাজ করছেন।”

ঘরে অসংখ্য কম্পিউটার। যিনি কাজ করছেন, তাঁর পিঠটা দেখতে পাচ্ছে ঝিনুকরা। মূল টেবিলের সম্পূর্ণ উলটো দিকে ঘুরে গিয়ে বডিখোলা কম্পিউটারে ঝুঁকে আছেন সমীরণবাবু। কম্পিউটারটা ওয়াল র‍্যাকের উপর বসানো।

দীপকাকু পারমিশন চাইলেন, “আসতে পারি?”

মুখ না ঘুরিয়ে সমীরণবাবু বললেন, “আসুন এবং কুইক, যা জিজ্ঞেস করার করে নিন। আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত।”

দীপকাকু চেয়ারে গিয়ে বসলেন। ঝিনুক বসবে কি না ঠিক করে উঠতে পারছে না। মনে হচ্ছে এই জিজ্ঞাসাবাদের পর্বটা দ্রুতই শেষ হবে।

গলাটা যতটা সম্ভব মোলায়েম করে দীপকাকু বললেন, “আপনাকে বিরক্ত করছি বলে খুবই খারাপ লাগছে আমার। কিন্তু এমন একটা প্রয়োজনে...”

সমীরণবাবু মুখোমুখি হলেন দীপকাকুর। চেয়ারটা রিভলভিং। ভদ্রলোকের বাঁ চোখে আতশ কাচ, কপালে লাগানো ব্যান্ডের সাহায্যে সেটা ঝুলছে। কাচ উপরে তুলে সমীরণবাবু বললেন, “পুলিশের লোক এত বিনয়ী হয়, জানতাম না তো।”

দীপকাকু বললেন, “আমি পুলিশের লোক নই। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। লালবাজারের এক পুলিশবন্ধু আমাকে এই কেসে হেল্প করছে।”

“হরেদরে সেই একই হল। বলুন, আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?” বললেন সমীরণবাবু।

ঝিনুক টুক করে দীপকাকুর পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। দীপকাকু বলতে থাকলেন, “একটা চুরির ঘটনায় আপনার সাহায্য নিতে এসেছি। চুরিটা হয়েছে আপনার পরিচিত এক ইঞ্জিনিয়ারবন্ধুর, দেবাংশু

boierpathshala.blogspot.com

সেনগুপ্ত।"

"দেবাংশু আমার বন্ধু, আপনাকে কে বলল?" বেশ বিরক্তি সহকারে প্রশ্নটা করলেন সমীরণবাবু।

দীপকাকু বললেন, "কেউ বলেনি সেভাবে। আসলে আপনারা একে অপরের পরিচিত, একই ধরনের কাজ করেন, সেই কারণেই বললাম।"

"একই ধরনের কাজ করি বলেই কি বন্ধু হয়ে গেলাম! কলকাতার সমস্ত গোয়েন্দা বুঝি আপনার বন্ধু?"

সমীরণবাবুর অশিষ্ট ব্যবহারে দীপকাকু একটু দমে গেলেন। সময় নিচ্ছেন পরের কথায় যাওয়ার। তার আগেই সমীরণবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী চুরি হয়েছে সেনগুপ্তর?"

দীপকাকু আগের মুডে ফিরে যাওয়ার জন্য গলাটা একবার ঝেড়ে নিলেন। বললেন, "একটা মেশিন আপগ্রেডেশনের জন্য দেবাংশুবাবু স্পেয়ার পার্টস এনেছিলেন সিঙ্গাপুর থেকে। ব্যাগ থেকে সেসব জিনিস উধাও হয়ে গিয়েছে।"

"বাজে কথা।"

সমীরণবাবুর মন্তব্য শুনে স্বাভাবিক কারণেই চমকালেন দীপকাকু। মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটাই কথা, "মানে?"

"বললাম তো, বাজে কথা। বানানো গল্প। মুখরক্ষার জন্য এসব ফেঁদেছে।"

ঝিনুক কোনও হেল্প করতে পারবে না জেনেও দীপকাকু একবার ওর দিকে তাকিয়ে নিলেন। তারপর সমীরণবাবুকে বললেন, "আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। 'মুখরক্ষা' বলতে আপনি কী মিন করতে চাইছেন?"

কপাল থেকে আতশ কাচের হেডব্যান্ডটা খুলে টেবিলে রাখলেন সমীরণবাবু। বললেন, "আমি আগেই জানতাম গ্রেট বাইটের প্রোডাকশন দেবাংশু বাড়াতে পারবে না। মুখে শুধু বড়-বড় কথা। আপনাদের নিশ্চয়ই বলেছে, ইলেকট্রিক্যাল ডায়গ্রামটাও হারিয়ে গিয়েছে?"

দীপকাকু উত্তর দেওয়ার অবস্থায় নেই। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আছেন। ফের সমীরণবাবুই বলতে থাকলেন, "ডায়াগ্রাম হারিয়ে গিয়েছে বলার কী সুবিধে জানেন? ফের ওটা তৈরি করতে এক মাসের উপর লাগবে, ততদিনে গ্রেট বাইটের সঙ্গে যে এগ্রিমেন্টটা ছিল, তার পিরিয়ড ওভার হয়ে যাবে। কাজটা থেকে মানে-মানে সরে পড়বে দেবাংশু। এইভাবে নিজের মুখরক্ষা করবে। নয়তো মার্কেটে ওর রেপুটেশনের তেরোটা বাজবে। বারোটা তো অনেকদিন আগেই বেজে গিয়েছে।"

দীপকাকুর চোখ-মুখ বলে দিচ্ছে, এক গ্লাস জল পেলে এই সময় একটু স্বস্তি পেতেন। শুকনো গলায় দীপকাকু বললেন, "দেবাংশুবাবু যে গ্রেট বাইটের অর্ডারটা নিয়েছেন, আপনি কী করে জানলেন?"

"না জানার কী আছে! নিজের লাইনের খবর রাখব না? এগ্রিমেন্টে কী লেখা হয়েছে সেটা পর্যন্ত জানি। শুধু চুরির মিথ্যে গল্পটা জানতাম না। আপনার কাছে শুনলাম।"

"দেবাংশুবাবু কি এর আগেও আপগ্রেডেশনের অর্ডার নিয়ে ফেল করেছেন?"

"একবার নয়, বহুবার। আপগ্রেডেশন কেন, রিপেয়ারিং নিয়েও নানা চ্যালেঞ্জ নিয়েছে। মরা মেশিনকে বলে জ্যান্ত করে দেবে। এই করেই তো ওর নামটা মার্কেটে খারাপ হয়েছে। গ্রেট বাইটের মালিক একেবারেই বোকা লোক, তাই ফেঁসেছে সেনগুপ্তর কাছে। সেনগুপ্তও চাইছে একটা বড়সড় সাকসেস। মার্কেটে ফিরে আসার জন্য এই সাফল্য ওর কাছে ভীষণ জরুরি।"

সমীরণবাবুর কথার পর দীপকাকু ভাবার জন্য সময় নিলেন। মিনিটখানেক বিরতির পর বললেন, "চুরিটা যদি সাজানো হয়, উনি আমাদের খরচ করে অ্যাপয়েন্ট করলেন কেন?"

"করল এই কারণে, ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে আপনারা ইনডাইরেক্টলি ওর চুরির গল্পটা প্রচার করে দেবেন আমাদের সার্কেলে।"

সমীরণবাবুর কথার পিঠে দীপকাকু বললেন, "কিন্তু আমরা তদন্তের শেষে যখন প্রমাণ করব, চুরিটা দেবাংশুবাবু নিজেই সাজিয়েছেন, আইনত অপরাধী হবেন উনি। ইচ্ছে করলে আমরা ওঁর শাস্তিরও ব্যবস্থা করতে পারি।"

"ততদিন কেসটা ও আপনাকে টানতেই দেবে না। দেখুন না, কাল-পরশুর মধ্যেই হয়তো বলবে, 'ইভেস্টিগেশনের আর দরকার নেই। ডায়াগ্রামটা নতুন করে রেডি করছি আমি।' আপনি ভাড়াটে গোয়েন্দা, ক্লায়েন্টের ইন্টারেস্ট না থাকলে ফালতু খাটতে যাবেন কেন? আপনাকে একটা ভাল উপদেশ দিচ্ছি, সময় থাকতে ওর কাছে ফুল পেমেন্টটা আদায় করে নিন। যদিও সহজে রাজি হবে না দিতে।"

'ভাড়াটে গোয়েন্দা' কথাটা কানে খট করে লাগল ঝিনুকের। বেশ অপমানজনক শোনাল পরিচয়টা। দীপকাকু মনে হচ্ছে কথাটা গায়ে মাখেননি। অন্য চিন্তায় মগ্ন। কপাল কুঁচকে টেবিলের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। একটু পরে মুখ তুলে সমীরণবাবুকে বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার দাস, আমাদের একটা সঠিক দিশা দেখানোর জন্য। দরকার পড়লে পরে আবার আসব।"

চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন দীপকাকু। ঝিনুকও উঠে দাঁড়াল। সমীরণবাবু বললেন, "পরে নিশ্চয়ই আসবেন। তবে লালবাজার থেকে ফোনটোন করাবেন না। স্ট্রেট চলে আসবেন। লালবাজার, পুলিশ এসব শুনলে কাজে কনসেস্ট্রেট করতে অসুবিধে হয়। আমি জানি, দেবাংশুই আপনাদের আমার কাছে পাঠিয়েছে, যাতে কাজে গণ্ডগোল করে ফেলি আমি। পুলিশ নিয়ে আমার ফোবিয়ার কথা ও জানে। এই বাড়িটার পজেশান নিতে গিয়ে পুলিশের কাছে ভীষণ নাকাল হয়েছিলাম।"

মেকি একটা হাসিসহ দীপকাকু বললেন, "এখন তা হলে আসি।"

ঝিনুকরা বেরিয়ে এল সমীরণ দাসের বাড়ি থেকে। দীপকাকুর মুখ থেকে চিন্তার মেঘ কাটেনি। বাইকের কাছে এসে হ্যান্ডেলে হাত রাখলেন। বললেন, "লোকটাকে ঠিক বোঝা গেল না, বুঝলে। আমাদের রাস্তা গুলিয়ে দিচ্ছে না তো? নাকি সত্যিই দেবাংশুবাবু নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে চুরির গল্পটা বানিয়েছেন?"

ঝিনুক দ্রুত গোটা ব্যাপারটা ভেবে নিল। বলল, "হতেও পারে, জানেন। চুরির একমাত্র সাক্ষী দেবাংশুবাবু নিজে। ঘটনাটা ওঁর কাছ থেকেই জানতে পারেন অফিসের দু'জন এবং দেবাংশুবাবুর স্ত্রী।"

ভ্যালিড পয়েন্ট। দীপকাকু সমর্থন জানালেন ঝিনুককে। তারপর বললেন, "সিঙ্গাপুর গিয়ে স্পেয়ার পার্টস কিনেছেন। এটা সত্যি। কারণ, সেগুলো ওঁর স্ত্রীকে দেখিয়েছেন। ক'দিন ধরে হয়তো আপগ্রেডেশনের কাজ করেছেন বাড়িতে। যখন দেখলেন, কাজটা ওঁর দ্বারা সম্ভব হল না। পার্টস, ডায়াগ্রাম ফেলে দিয়ে চুরির গল্পটা খাড়া করলেন।"

ঝিনুক বলল, "ওঁকে দেখে কিন্তু এরকম মিথ্যেবাদী মনে হয় না।"

দীপকাকু ঝিনুকের দিকে ধমকের দৃষ্টিতে তাকালেন। মনে করিয়ে দিলেন পুরনো পরামর্শ, চেহারা দেখে কোনও মানুষকে বিচার করবে না। চেহারাটা মানুষের স্থায়ী পোশাক ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঝিনুক মাথা নিচু করে নিয়েছে। বাইকে উঠে বসলেন দীপকাকু। বললেন, "সমীরণবাবুর কথা খুব সহজেই যাচাই করা যায়। সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ারদের মহলে খোঁজ করলেই জানা যাবে, আর কোন-কোন কোম্পানির ক্ষেত্রে দেবাংশুবাবু একই ঘটনা ঘটিয়েছেন। অসাধ্যসাধন করব বলেও পারেননি। এখন চলো, দেবাংশুবাবুর আর-এক কম্পিটিটর সূর্য রায়ের সঙ্গে কথা বলে দেখি।"

বাইক স্টার্ট দিলেন দীপকাকু। ঝিনুক পিছনে উঠে বসল। বিকেল গড়িয়ে এখন সন্ধে নামছে।

তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদ পর্বটা ভীষণ বোরিং। একই প্রশ্ন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে করা হয় বিভিন্নজনকে। কোন প্রশ্ন কখন করা হবে, সে এক জটিল অঙ্ক। ঝিনুক ম্যাথে কোনওদিনই স্বচ্ছন্দ নয়। দীপকাকুর প্রশ্নগুলো ফলো করতে গিয়ে হিমশিম খেল সে। আবার একথা মানতেই হবে, ওই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে রহস্যের জট অনেকটাই খুলে ফেলা যায়। কিন্তু দেবাংশুবাবুর কেসে উলটো ফল হচ্ছে, জট পাকিয়ে যাচ্ছে আরও। এখন দেখা যাক, সূর্য রায় কতটা হেল্প করতে পারেন।

boierpathshala.blogspot.com

মিনিট পাঁচেক হল ঝিনুক, দীপকাকু সূর্য রায়ের অফিসে এসে পৌঁছেছেন। ভদ্রলোক বয়সে দেবাংশুবাবুর চেয়ে বছর পাঁচেকের হয়তো জুনিয়র। ক্লিন শেভ, ঝকঝকে চেহারা। খুবই সপ্রতিভ। ঝিনুকদের আসার খবর পেয়ে নিজেই এগিয়ে এলেন। সাদরে নিয়ে এসে বসালেন চেম্বারে। বললেন, "লালবাজারের ফোন পেয়েছি। আপনারা একটু বসুন, এখনই আসছি।"

সূর্য রায় ঘর ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে দীপকাকু চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। ভেবে-ভেবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। গাড়িও চালাচ্ছেন নাগাড়ে। চেম্বারটা এয়ারকন্ডিশন্ড, জিরিয়ে নিচ্ছেন দীপকাকু। ঝিনুকের চোখ বোজার কোনও উপায় নেই। সূর্য রায় ঘরে ঢুকলেই দীপকাকুকে ঠেলে তুলে দিতে হবে। বিনা ভূমিকায় ঘুমিয়ে পড়তে উনি ওস্তাদ। সূর্য রায়ের চেম্বারটাই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে ঝিনুক। দেখার অবশ্য বিশেষ কিছু নেই, খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর। টেবিলে কম্পিউটার, একপাশে কিছু কাগজপত্র, মেশিন-কোম্পানির ক্যাটালগ। পেনস্ট্যান্ড, বাহারি পেপারওয়েট। চেম্বারের দেওয়ালে ডিজিটাল ঘড়ি আর চারটে বিশাল সাইজের ফোটোগ্রাফ। চারটেই ল্যান্ডস্কেপের ছবি। বেশ যত্ন করে বাঁধানো।

সূর্য রায়ের অফিসটা ক্রিক রো-তে। বাড়ি সল্টলেকে। এখানে আসার পথে দীপকাকু তথ্য দু'টো দিলেন। ওই সময় বাবার ফোন এল ঝিনুকের মোবাইলে। চলন্ত বাইকে বসে কথা বলল ঝিনুক। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "তোদের ইনভেস্টিগেশন কোন পর্যায়ে?"

ঝিনুক বলল, "খুব একটা এগোয়নি। এখন এক ইঞ্জিনিয়ারকে ইন্টারোগেশন করতে যাওয়া হচ্ছে।"

"বাড়ি ফিরতে ক'টা বাজবে?" জানতে চাইলেন বাবা।

ঝিনুক বলল, "আজকের মতো এটাই শেষ সাক্ষাৎকার মনে হচ্ছে।"

"তোদের ওই সব জেরায় কোনও কাজ হবে না। খামোকা লোকগুলোকে ব্যস্ত করা। এই চুরির রহস্য আমি অনেকটা উদ্ধার করে ফেলেছি। দীপঙ্করকে নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আয়, সব বলব।"

বাবার সঙ্গে আর কথা বাড়ায়নি ঝিনুক, "ঠিক আছে," বলে ফোন কেটেছিল। এতক্ষণ ঘুরে ঝিনুকরা রহস্য সমাধানের কিনারে পৌঁছতে পারল না, বাবা অফিস আর বাড়ি করেই সব জট খুলে ফেললেন! এটা বাবার বরাবরের অভ্যেস, দ্রুত সমাধানে পৌঁছতে চান। ফলে তাঁকে কিছু অবাস্তব আইডিয়ার সাহায্য নিতে হয়। সেই সব পরামর্শ কোনও কাজেই লাগে না দীপকাকুর।"

পুশ-ডোর ঠেলে কেবিনে ঢুকলেন সূর্য রায়, ঝিনুক দীপকাকুকে ঠেলতে গিয়ে দেখল, চোখের পাতা খুলে ফেলেছেন। কী করে টের পেলেন, দরজা খোলা হচ্ছে! কোনও আওয়াজ হয়নি। ঘরে হাওয়ার চাপটা একটু বদলে গিয়েছিল।

সূর্য রায়ের হাতে ট্রে, উপরে তিনটে বিগ সাইজের কাগজের কাপ। বললেন, "কফি, চলবে তো?"

দীপকাকু বললেন, "খুব চলবে। কিন্তু আপনি নিয়ে এলেন কেন, অন্য কোনও স্টাফ তো..."

"না, আমার এই ছোট্ট অফিসে এটাই রীতি। যে-যার নিজের জিনিস নিয়ে এসে খাও। কাউকে অর্ডার করা যাবে না।"

ট্রে-টা টেবিলে নামিয়ে রেখে সূর্য রায় গিয়ে বসলেন নিজের চেয়ারে। দীপকাকু কফির কাপ তুলে নিলেন।

ঝিনুকও খাবে। মাঝে-মাঝে কফি খেতে তার খারাপ লাগে না।

কাপে চুমুক দিয়ে দীপকাকু বললেন, "একটা চুরির ঘটনায় আপনার কাছে এসেছি, আমার বন্ধুর ফোনে আপনি জেনে গিয়েছেন সেটা। এবার আমাকে বলুন, দেবাংশু সেনগুপ্ত নামে কাউকে চেনেন কি?"

"যদি ইঞ্জিনিয়ার দেবাংশু সেনগুপ্ত হন, তা হলে অবশ্যই চিনি," বলে, একটা কফির কাপ তুলে নিলেন সূর্য রায়।

দীপকাকু বললেন, "হ্যাঁ, তাঁর কথাই বলছি। চুরিটা তাঁরই হয়েছে। সিঙ্গাপুর থেকে ইলেকট্রনিক পার্টস নিয়ে এসেছিলেন, ব্যাগ থেকে হাওয়া।"

"এ হেঃ, খুবই খারাপ ঘটনা তো। নিশ্চয়ই অনেক টাকার জিনিস? দেবাংশুদা ছোটখাটো অর্ডার ধরার লোক নন," বললেন সূর্য রায়।

দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "দেবাংশুবাবু ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কেমন?"

"আমাদের লাইনে সারা ইন্ডিয়ার মধ্যে বেস্ট।"

কফি খাওয়া ভুলেই গিয়েছে ঝিনুক, ইনি তো সমীরণবাবুর বিপরীত কথা বলছেন।

দীপকাকুও ভীষণ অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়ই। ফের জিজ্ঞেস করলেন, "দেবাংশুবাবুর সাকসেস রেট কেমন?"

"নাইনটি পারসেন্ট তো হবেই। যন্ত্রপাতির ব্যাপারে টেন পারসেন্ট ফেল কোনও ব্যাপারই নয়।"

"কিন্তু সমীরণবাবু তো উলটো কথা বলছেন। দেবাংশুবাবুর নাকি মার্কেটে খুব বদনাম। বড়-বড় কথা বলে কাজ ধরেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডোবান।"

"ও, আপনারা তা হলে সমীরণদার বাড়ি হয়ে এখানে এসেছেন? ভালই করেছেন লোকটাকে আগে দেখে এসে। ওঁর মতো হামবাগ ইঞ্জিনিয়ার কলকাতায় দু'টো নেই। এক সময় খুব পশার ছিল। আমি, দেবাংশুদা কাজ শুরু করতেই ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছেন। মডার্ন টেকনোলজি নিয়ে পড়াশোনা করেননি। যা শিখেছিলেন ইয়ং এজ-এ, তাই ভাঙিয়ে খাচ্ছেন। আমাকে আর দেবাংশুদাকে প্রচণ্ড হিংসে করেন। দেবাংশুদাকে বেশি।"

"বেশি কেন?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

সূর্য রায় বললেন, "দেবাংশুদা বরাত নেয় চ্যালেঞ্জিং কাজের। সাকসেসও পায়। আমি ওসব ঝুঁকির কাজ নিই না। দেবাংশুদার মতো আমি জিনিয়াস নই। সার্ভিসিংয়ের যা অর্ডার আসে আমার কাছে, সেটাই সাকসেসফুলি করার চেষ্টা করি। মার্কেটে দেবাংশুদার একটা আলাদা রেসপেক্টেবল পজিশন তৈরি হয়েছে। এটাকেই হিংসে করেন সমীরণদা। এক সময় ওই রেসপেক্টটা কারখানার মালিকরা ওঁকে করত।"

দীপকাকু পরের কথায় যাওয়ার আগে এক ঢোক কফি খেয়ে নিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কী মনে হয়, কে চুরি করতে পারে দেবাংশুবাবুর জিনিসগুলো?"

সূর্য রায় বললেন, "দেখুন, দেবাংশুদার কাজের উপর অনেকেরই নজর আছে। আমি অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বের ইঞ্জিনিয়ারদের কথাও বলছি। সমীরণদার তো আছেই। এদের মধ্যে যে কেউ চুরি করতে বা করাতে পারে।"

"আর আপনি?" দীপকাকু স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে প্রশ্নটা করলেন। এই সময় ওঁর ব্যক্তিত্ব ভীষণ কঠোর টাইপের হয়ে যায়।

সূর্য রায় কিন্তু তেমন নার্ভাস হলেন না। ম্লান হাসিসহ বললেন, "আপনি গোয়েন্দা। কাউকেই সন্দেহের ঊর্ধ্বে আপনি রাখবেন না, জানি। আমার স্বপক্ষে শুধু একটাই কথা বলি, দেবাংশুদাকে আমিও খুব শ্রদ্ধা করি। দেবাংশুদার সাফল্যে আনন্দিত হই। যাকে প্রকৃত শ্রদ্ধা করা যায়, তার কাছ থেকে চুরির কথা ভাবাও যায় না। তা ছাড়া চুরি ব্যাপারটা স্বভাবজাত। চুরি সকলে করতে পারে না।"

"দশ লাখ টাকার অর্ডার হলেও, না?" কথার পিঠে জানতে চাইলেন দীপকাকু।

সূর্য রায় একটু থমকালেন। বিস্ময়ের কণ্ঠে বললেন, "এত টাকার কন্ট্রাক্ট নিয়েছিল দেবাংশুদা। ইটস আ রিয়েলি বিগ অর্ডার। কোন কোম্পানির জানতে পারি কি?"

"গ্রেট বাইট বিস্কুট কোম্পানির। প্রোডাকশন বাড়ানোর বরাত নিয়েছিলেন। অফারটা আপনার কাছে এলে নিতেন?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

সূর্য রায় বললেন, "অবশ্যই নিতাম। তবে আমি শিওর, অফারটা কোম্পানি দেবাংশুদাকে দেয়নি। হয়তো ওদের মেশিন সারাতে গিয়ে দেবাংশুদাই বলেছে, আপনাদের মেশিনের প্রোডাকশন বাড়িয়ে দিতে পারি। এভাবেই চ্যালেঞ্জ ডেকে নেওয়া দেবাংশুদার স্বভাব।"

boierpathshala.blogspot.com

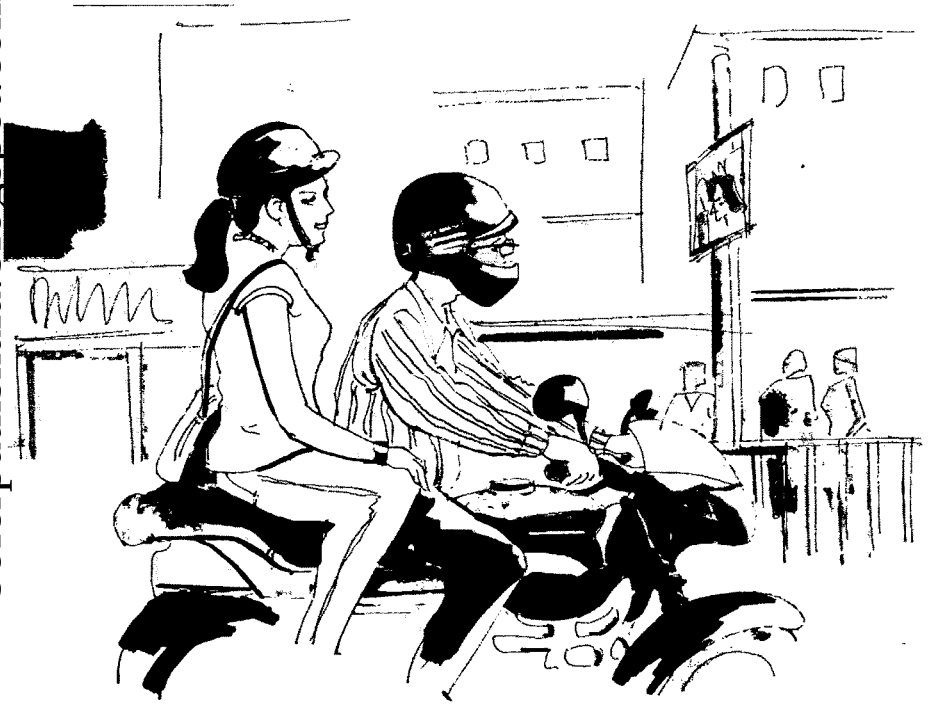

তিনজনের কফি শেষ। দীপকাকুর বোধ হয় আর কিছু জানার নেই। দেওয়ালের ছবিগুলোর উপর চোখ বোলাতে লাগলেন। বলে উঠলেন, "ফোটোগুলো আপনার তোলা, তাই না?"

সূর্য রায় বেশ অবাক হলেন। বললেন, "কী করে বুঝলেন? কোথাও তো আমি নাম লিখে রাখিনি!"

"এটাই তো আমাদের কাজ। সাধারণ চোখে যা ধরা পড়ে না, আমরা সেটা দেখতে পাই," দীপকাকুর আত্মবিশ্বাসটা একটু অহঙ্কারের মতো শোনাল।

সূর্য রায় কিন্তু মোহিত হয়ে পড়েছেন দীপকাকুর দেওয়া ছোট্ট স্যাম্পেলিং-এ। বললেন, "প্লিজ, আমাকে বলুন না, কোন সূত্রে আপনি ধরতে পারলেন, ফোটোগুলো আমার তোলা? গোয়েন্দার আশ্চর্য অনুমানক্ষমতা আমি গল্পের বইয়ে পড়েছি। আজ চোখের সামনে দেখলাম।"

দীপকাকু বললেন, "আপনার পিতলের পেনস্ট্যান্ডে গ্যাংটকের এনচে মনাস্ট্রির ছবি এনগ্রেভ করা। ওই মনাস্ট্রিরই ফোটো তুলেছেন আপনি।"

ফোটোফ্রেমটার দিকে আঙুল তুলে দেখালেন দীপকাকু। ফের বললেন, "একই সাবজেক্টের ছবি দু'টো মিডিয়ামে। দু'টো জিনিস যদি একসঙ্গে কেউ গিফ্‌ট করে, সাবজেক্টটা রিপিট করত না। আপনার নিশ্চয়ই মনাস্ট্রিটা ভাল লেগে গিয়েছিল, তাই ফোটো তো তুলেইছেন, একটা স্মারকও নিয়ে আসার ইচ্ছে হয়েছিল। গ্যাংটকের বাজার থেকে কিনেছেন পেনস্ট্যান্ডটা।"

সূর্য রায় অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন দীপকাকুর দিকে। বললেন, "প্রায় ঠিকই বলেছেন। পেনস্ট্যান্ডটা অবশ্য আমার স্ত্রী আমাকে গিফ্‌ট করেছে। তার কারণ, মনাস্ট্রিকে আমার ভাল লাগা। অনেকটা সময় দিয়ে ফোটোটা তুলেছিলাম। মিসেস সেটা লক্ষ করেছিল। গ্যাংটকের বাজারে পেনস্ট্যান্ডটা দেখতে পেয়ে কিনে দিল আমায়। লক্ষ করে দেখুন, মনাস্ট্রিটা অনেকটা চিনা প্যাগোডার আদলে তৈরি। ভারতে এরকম মনাস্ট্রি খুব একটা দেখা যায় না।"

"ঠিকই বলেছেন আপনি। মায়নমারে বেশ কিছু জাপানি আদলের প্যাগোডা আছে," এই তথ্যটা যোগ করলেন দীপকাকু।

সূর্য রায় বললেন, "এই ফোটোর ব্যাপারটা না হয় বোঝা গেল। বাকিগুলো যে আমিই তুলেছি, কী করে বুঝলেন?"

"ফোটো তোলার ধরন দেখে। প্রথমত সব ক'টা ফোটোয় ল্যান্ডস্কেপ প্রাধান্য পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, আপনি ফোর গ্রাউন্ডে অনেকটা জায়গা ছাড়েন, পারস্পেক্টিভ বোঝাতে গেলে ফ্রেমের উপরে কোনও একটা সাবজেক্ট ধরেন। শুধু প্লেন থেকে তোলা ছবিটার ক্ষেত্রে সে সুযোগ পাননি।"

দীপকাকুর জ্ঞানের বহর দেখে সূর্য রায় এবার পুরোপুরি বাক্যহারা হয়ে গিয়েছেন। একটু পরে বিস্ময়ের ঘোর থেকে বললেন, "আপনি

boierpathshala.blogspot.com

তো মশাই ফোটোগ্রাফিটাও গুলে খেয়েছেন।"

দীপকাকু সবিনয়ে বললেন, "আমার কিছু ফোটোগ্রাফার বন্ধু আছে, তাদের কাছেই এসব জেনেছি। আমি কিন্তু ফোটো তোলার ব্যাপারে খুবই কাঁচা। থিয়োরিটিক্যালি ফোটোগ্রাফিটা হয়তো কিছুটা বুঝি, আপনাদের মতো এত সুন্দর ছবি তুলতে পারি না।"

কথা শেষ করে দীপকাকু উঠে গেলেন প্লেন থেকে তোলা ফোটোটার কাছে। ফোটোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এটা তো বিদেশযাত্রার ফোটো মনে হচ্ছে। সমুদ্রের পাশে যে শহরটা দেখা যাচ্ছে, এ দেশের নয়। দারুণ তুলেছেন ফোটোটা।"

চেয়ার ছেড়ে সূর্য রায় উঠে গেলেন দীপকাকুর পাশে। বললেন, "বছরপাঁচেক আগে একবার সিঙ্গাপুর গিয়েছিলাম, তখনই ফোটোটা তুলি। সাবজেক্টটা লক্ষ করুন, শহরের আবর্জনা কীভাবে দূষিত করছে সমুদ্রকে!"

ফোটোর কাচে আঙুল ঠেকিয়ে সূর্য রায় বললেন, "এই দেখুন, শহরের নালা থেকে বেরিয়ে আসছে কালো ময়লা জল। সমুদ্রের নীল জলে ছড়িয়ে পড়ছে।"

ঝিনুকও উঠে এল চেয়ার থেকে। কাছে গিয়ে দেখল ফোটোটা। দীপকাকু ফোটো থেকে চোখ সরিয়ে সূর্য রায়কে জিজ্ঞেস করলেন, "গত পাঁচ বছরে ওই একবারই আপনি সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, কেন বলুন তো?" সূর্য রায়ের গলায় বিস্ময় মেশানো প্রশ্ন। ফোটো থেকে মন সরে গেল ঝিনুকের, কান রাখল দীপকাকু, সূর্য রায়ের কথাবার্তায়।

দীপকাকু বললেন, "আসলে আপনাদের লাইনের সমস্ত আধুনিক যন্ত্রাংশ তো সিঙ্গাপুর বাজারে পাওয়া যায়, তাই বলছিলাম..."

কথার মাঝে সূর্য রায় বলে উঠলেন, "আমার যাওয়ার খুব একটা দরকার পড়ে না। একবারই গিয়েছিলাম শখ করে। আমার বিদেশযাত্রা বলতে ওই একবারই। আমি তো ইনোভেটিভ কিছু তৈরি করি না, বিদেশি মেশিন খারাপ হলে সারাই করি মাত্র। স্পেয়ার পার্টস-এর জন্য ই-মেলে অর্ডার করি কোম্পানিকে। ওরা কুরিয়ারে পাঠিয়ে দেয়।"

"স্পেয়ার পার্টস কিনতে সমীরণবাবু কি যান সিঙ্গাপুরে?"

"জানি না। ঠিক বলতে পারব না।"

সূর্য রায়ের কথার পরে দীপকাকু হাত বাড়িয়ে দিলেন হ্যান্ডশেকের জন্য। বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার রায়। আজ তা হলে আসি। দরকার পড়লে আবার আসব কিন্তু।"

দীপকাকুর হাত ছেড়ে সূর্য রায় বললেন, "ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম। ইটস মাই প্লেজার। কাইন্ডলি আপনার একটা কার্ড যদি দিয়ে যান, পরে একটা ব্যাপারে যোগাযোগ করব।"

"কী ব্যাপারে বলুন তো?" কপালে ভাঁজ ফেলে জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

একটু ইতস্তত করে সূর্য রায় বললেন, "আসলে এই সময় কথাটা তুললে বড্ড অপ্রাসঙ্গিক শোনাবে বলেই বলিনি। একটা সিরিয়াস কাজে ব্যস্ত আছেন আপনারা। তবু যখন জিজ্ঞেস করছেন, বলি, ইনি নিশ্চয়ই আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট?"

ঝিনুককে দেখিয়ে কথাটা বললেন সূর্য রায়। দীপকাকু বললেন, "হ্যাঁ, তো?"

"ওঁর ফেস খুব ফোটোজনিক। যদি পারমিশন দেন আপনারা, কয়েকটা ক্লোজ-আপ তোলার ইচ্ছে রইল আমার।"

কথাটা শুনে দীপকাকু একবার চকিতে ঝিনুকের মুখের দিকে তাকালেন, যেন দেখে নিলেন সত্যিই ফোটোজেনিক কি না। তারপর বললেন, "তুলবেন। এতে অসুবিধের কী আছে?"

ঝিনুক পড়েছে খুবই অপ্রীতিকর অবস্থায়। এক্সপ্রেশন কীরকম রাখবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। এখানে এসেছে এক কাজে, কথা শেষ হচ্ছে তার প্রসঙ্গে।

দরজার দিকে যেতে-যেতে দীপকাকু অবশ্য পুরনো বিষয়টা ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, "সামনের দু'-চার দিনের মধ্যে কেউ যদি আপনাকে কোনও স্পেয়ার পার্টস বিক্রি করতে আসে, একটু যাচাই করে নেবেন। চোরাই জিনিস বুঝলে, তখনই ফোন করবেন আমাকে।"

"অবশ্যই। সে আর বলতে," বললেন সূর্য রায়।

ঝিনুকরা বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। সূর্য রায়ও সঙ্গে এলেন এগিয়ে দিতে।

মৌলালি ক্রসিং-এ বাইক দাঁড় করিয়েছেন দীপকাকু। সিগন্যাল পাওয়া যায়নি। সন্ধে উতরে গিয়েছে অনেকক্ষণ, চারপাশে জ্বলে উঠেছে নিয়নের আলো। সূর্য রায়ের ক্রিক রো-র অফিস থেকে এই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছতে লেগেছে মিনিটতিনেক, একটাও কথা বলেননি দীপকাকু। এখন বলে উঠলেন, "তুমি তো দেখছি অনেকক্ষণ ধরে কিছু নোট করছ না। এত কথাবার্তা হল, প্রচুর ইমপর্টান্ট পয়েন্টস ছিল এর মধ্যে।"

"বাড়ি ফিরে নোট করে নেব," বলল ঝিনুক।

"তোমার ফোটো তুলতে চাওয়ার কথাটা আবার লিখো না।"

ঝিনুক যেহেতু বাইকের পিছনের সিটে, দেখতে পাচ্ছে না দীপকাকুর এক্সপ্রেশন। নিশ্চয়ই হাসছেন। এখনও মজা করার মুডে আছেন! কেস তো পেঁচিয়ে জিলিপি হয়ে গিয়েছে।

সামনের গাড়িগুলো থেকে স্টার্টের আওয়াজ উঠল। সিগন্যাল পাওয়া গেল তার মানে। দীপকাকুও বাইকে কিক মারলেন। ঝিনুক জিজ্ঞেস করল, "এখন তা হলে আমরা বাড়ি ফিরছি?"

"না। আর-একজনের কাছে যাওয়া বাকি আছে।"

"কে সে?"

"গেস করো।"

আন্দাজ করার মতো মনের অবস্থা এখন আর ঝিনুকের নেই। এবার মানে-মানে বাড়ি ফিরতে পারলে হয়। বাবা কী সমাধান সূত্র বের করেছেন দেখা যাক। হয়তো দেখা গেল এই কেসে বাবার চিন্তাভাবনাই ঠিক। দীপকাকু যে রাস্তায় হাঁটছেন, মনে হয় না এই আশ্চর্যজনক চুরির গভীরে ঢুকতে পারবেন। চুরি কীভাবে হয়েছে, সেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন না। কে চুরি করতে পারে, এই নিয়েই ভাবছেন বেশি। ঝিনুকরা তাই গ্রহের মতো ঘুরে যাচ্ছে কেসটাকে ঘিরে।

মল্লিকবাজারের কাছে এসে বাইকের গতি কমিয়ে সাইড নিচ্ছেন দীপকাকু। ঝিনুক বুঝতে পারল, কার কাছে যাওয়া হবে এখন। বাড়তি উৎসাহ নিয়ে বলে উঠল, "মিস্টার আফাংয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

বাইক স্ট্যান্ড করে দীপকাকু বললেন, "পৌঁছে যাওয়ার পর বলছ! এত ক'টা কেসে আমার সঙ্গে থেকে তা হলে কী উন্নতি হল?"

ভর্ৎসনা গায়ে মাখল না ঝিনুক। কোনও কিছু শিখতে গেলে বকুনি খেতেই হয়।

মল্লিকবাজারে সারসার গাড়ি সারানোর দোকান। দীপকাকু এক দোকানের মালিককে আফাংয়ের নামটা বললেন। ঠিকানা বলতে হল না। পঞ্জাবি মালিক বললেন, "দু'টো গলি ছেড়ে থার্ড গলিতে ঢুকে যান। ডান সাইডে চারটে বাড়ির পর তিনতলা বাড়ি। টপ ফ্লোরে থাকে।"

তিন নম্বর গলির মুখে এসে ঝিনুকের মনে হল, এতক্ষণে সত্যিই তারা চুরি-রহস্যের গভীরে ঢুকছে। দীপকাকুর পকেটে আছে দেবাংশুবাবুর ব্যাগের চাবি। মিস্টার আফাংকে সেটা দেখানো হবে। আফাং বলে দেবেন, রিসেপ্টলি কে তাঁর কাছে চাবি ডুপ্লিকেট করিয়েছে। লোকটার চেহারার বর্ণনা দেবেন মিস্টার আফাং। চোর শনাক্তকরণে দীপকাকু অনেকটাই এগিয়ে যাবেন। বাকি থাকবে শুধু কোন ফাঁকে চুরিটা হয়েছে, সেটা জানা।

দোকান মালিকের নির্দেশমতো তিনতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন ঝিনুকরা। পুরনো বাড়ি। দেড়শো, দু'শো বছরের তো হবেই।

boierpathshala.blogspot.com

দরজা হাট করে খোলা। দীপকাকু, ঝিনুক বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়লেন। সিমেন্টের চৌকো দালান। তিনদিকে পরিকল্পনাহীন ঘর, বারান্দা। তারে ঝোলানো জামা, কাপড়, পরদা এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এই বাড়িতে একসঙ্গে প্রচুর পরিবার বাস করে। একতলার বারান্দায় একটি লোককে বেরিয়ে আসতে দেখে, দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "ইঞ্জিনিয়ার আফাংয়ের ঘরটা কোথায়?"

লোকটি সিঁড়ি দেখিয়ে বলল, "সোজা তিনতলায় চলে যান। বাঁ-হাতি ঘর।"

সিঁড়িতে আলো নেই। অন্যান্য ঘর থেকে যৎসামান্য এসে পড়েছে। ঝিনুকরা সাবধানে উঠে এলেন তিনতলায়। কিন্তু এ কী, বাঁ দিকের ঘরে তালা ঝুলছে!

ঝিনুক, দীপকাকু দরজার সামনে গেলেন। হ্যাঁ, এটা মিস্টার আফাংয়েরই ঘর। দরজার পাল্লায় সাদা রঙে ইংরেজিতে নাম লেখা। পাশে চাইনিজ় অক্ষরে বোধ হয় ওই নামটাই লেখা আছে। ঝিনুকের চোখ দরজার কড়ায়। বলল, "তালাটা দেখেছেন, একেবারে অন্যরকম।"

দীপকাকু বললেন, "হুঁ। বিদেশি তালা। চাবিবিশারদের কাছে এরকম তালা থাকাই স্বাভাবিক।"

পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করলেন দীপকাকু। বারান্দার হলুদ বাল্বের আলোয় পরীক্ষা করলেন তালাটা। বললেন, "মেড ইন চায়না।"

ঝিনুক বলল, "গেলেন কোথায়?"

"দেখছি, দাঁড়াও," বলে দীপকাকু উলটো দিকের ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ডোরবেল টিপলেন।

দরজা খুলে যেতে দেখা গেল এক বৃদ্ধকে। জিজ্ঞেস করলেন, "কিস কো মাঙতা? কাকে চাই?"

দীপকাকু বললেন, "মিস্টার আফাংয়ের ঘরে দেখছি তালা। কোথায় গিয়েছেন, বলতে পারেন?"

ভদ্রলোক অবাক হয়ে আফাংয়ের দরজায় চোখ রাখলেন। বললেন, "কোথায় গেল, কাঁহা গ্যায়া। আজকাল ঘর সে নিকলতা নেহি হ্যায়। তবিয়ত খারাপ। পার্টি লোগ এখানে এসে কাম করিয়ে নিয়ে যায়। উমর ভি হো গ্যায়া।"

"কাছাকাছি ওঁর কোনও রিলেটিভের বাড়িতে হয়তো যেতে পারেন," বললেন দীপকাকু।

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, "কহি নেহি যাতা হ্যায়। আগে চাঁদনিচকে দুকান ছিল। এখন বাড়িতেই কাম-কাজ করে।"

বৃদ্ধকে ধন্যবাদ জানিয়ে দীপকাকু সিঁড়িতে পা রাখলেন। ঝিনুককে বললেন, "মনে হচ্ছে, মৌচাকে ঢিল লেগেছে।"

"মানে?" জানতে চাইল ঝিনুক।

"আমরা কাজে নেমেছি জেনে, অপরাধী আফাংকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছে।" দীপকাকু আর কোনও কথা বললেন না। এখন সিঁড়িতে শুধুই তাঁর ভারী বুটের শব্দ।

॥ ৩ ॥

পরের দিন সকাল থেকেই বৃষ্টি। দীপকাকুর আসার কথা ন'টায়। দশটা বাজতে চলল। ঝিনুক রেডি হয়ে সেই থেকে আনচান করছে বাড়িতে। দীপকাকুর মোবাইলে ফোন করল। সুইচড অফ। বাড়িতেও ফোন করেছিল। কাজের মাসি তুলল। কানে কম শোনে। ঝিনুক চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "দীপকাকু কোথায়?"

তিনবারের বার উত্তর এল, "তিনি তো কোন সকালে ধরাচুড়ো পরে বেরিয়ে গেলেন।"

ধরাচুড়ো বলতে মাসি বোধ হয় বর্ষাতির কথা বোঝাল। এত সকালে কোথায় বেরোলেন দীপকাকু? দেবাংশুবাবুর বাড়িতে যাওয়ার কথা তো দশটায়। কাল ঝিনুকদের বাড়িতে বসে দীপকাকু ফোনে সময়টা ওঁকে বলেছিলেন। উনি বলেছিলেন, "চলে আসুন। আমি তো আপনার ফোনের অপেক্ষাতেই ছিলাম। ইতিমধ্যে কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমার অফিস বা বাড়িতে ঘটেনি।"

দীপকাকু বলেছিলেন, "ফাইন। কাল আমরা যখন যাব, বাড়ির কাজের লোকটি যেন থাকে।"

দেবাংশুবাবু বলেছিলেন, "বাপনের-মা ওই সময়টা বাড়িতেই থাকে।"

সব কথাবার্তা হয়ে গেল, ওদিকে দীপকাকুর দেখা নেই। বৃষ্টি মাঝে-মাঝেই তেড়েফুঁড়ে আসছে। ঝড়বাদলার জন্য কি দীপকাকু একাই চলে যাবেন দেবাংশুবাবুর বাড়ি? আশা করা যায় ঝিনুকের প্রতি এতটা অন্যায় ব্যবহার উনি করবেন না। কারণ, কাল রাতে যখন উঁদন্তটা নিয়ে বসা হল বাবার সঙ্গে, দীপকাকু আলোচনার শুরুতেই পড়া ধরার মতো জিজ্ঞেস করেছিলেন, "আজ অনেক কিছুই তো নোট করোনি। বললে, 'সব মনে থাকবে।' বলো তো দেখি, কার সঙ্গে কী-কী কথা হয়েছে। ইমপর্ট্যান্ট পয়েন্টগুলো শুধু বলবে। সব মিলিয়ে তোমার কী ধারণা, কোথায় খটকা, সেটাও জানাও।"

মা তখন ছিলেন ঘরে। বললেন, "লেখেনি যখন, ও আর বলতে পারবে না। মুখস্থ ওর দ্বারা কোনওদিনই হয় না। আমি ওর স্কুললাইফ থেকে বলে আসছি, যা পড়বি, ছোট-ছোট নোট রাখবি। পড়ায় যখন মন দেয়, নোট করে। অন্যমনস্ক হলেই সেসবের বালাই থাকে না।"

মায়ের বক্তৃতায় রেশ টানতে বাবা বললেন, "তুমি দীপঙ্করকে কী খাওয়াবে বলছিলে, বেশ রাত হল, এবার তো ও বাড়ি যাবে।"

মা তখনই ছুটলেন কিচেনে। যাওয়ার সময় বললেন, "দীপঙ্কর তো রাতের খাবার খেয়েই যাবে।"

দীপকাকুকে খাইয়ে মায়ের খুব শান্তি। রান্নার ব্যাপারে সমঝদার লোক। যে-কোনও সাধারণ রান্নার মধ্যেও অসামান্যতা খুঁজে বের করতে পারেন। বাবা অবশ্য মজা করে বলেন, "এটা দীপঙ্করের বারবার নেমতন্ন পাওয়ার ফন্দি।"

সে যাই হোক, ঝিনুক কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদ পর্বের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ ঝরঝর করে বলে দিয়েছিল। দেবাংশুবাবুর অফিসের কথাগুলো নোট করা ছিল, সেগুলো বলার জন্য খাতা ওলটাতে হয়নি।

দীপকাকু বলেছিলেন, "ভেরি গুড। এই না হলে অ্যাসিস্ট্যান্ট। প্রায় কম্পিউটার মেমরি তোমার।"

প্রশংসাটা কানে বেশি-বেশি ঠেকেছিল ঝিনুকের। দীপকাকু তো চট করে এরকম দরাজ সার্টিফিকেট দেন না। এমন নয়তো, তদন্তের পর্যায়টা ঝিনুকের মাধ্যমে বাবাকে শুনিয়ে দিলেন। সারাক্ষণ ঘোরাঘুরি করে নিজে অত্যন্ত ক্লান্ত। খাটনি বাঁচানোর আরকী।

মা তখন ঢুকলেন চা নিয়ে। অতি আগ্রহে জানতে চাইলেন, "পেরেছে বলতে?"

দীপকাকু বললেন, "মুখস্থ তো ভালই বলল। এখন দেখা যাক মাথায় কতটা ঢুকেছে। অ্যানালিসিস কতটা করতে পারে দেখি।"

মা বললেন, "না বুঝে ও মুখস্থ করতে পারে না। পরের কাজটাও পারবে।"

মা এমনভাবে কথাটা বললেন, ঝিনুক যেন স্কুল-কলেজের টাস্ক দিচ্ছে। ওসবের বাইরেও যে ঝিনুকের আলাদা ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে, মা বিশ্বাসই করতে চান না।

চা রেখে মা চলে যাওয়ার পর ঝিনুক নিজের ধারণা এবং খটকার কথা বলছিল। এক নম্বর খটকা হচ্ছে, "আমরা কেন এখনও গ্রেটবাইট কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ারকে জেরা করিনি?"

উত্তরে দীপকাকু বললেন, "সন্দেহের প্রথম তালিকায় উনি নেই। ওঁর হয়ে আছেন বসন্ত আগরওয়াল। চুরিটা মালিক করাবে, মেশিন আপগ্রেড করতে দেবে ইঞ্জিনিয়ারকে। মালিক সন্দেহের বাইরে গেলেই আমরা ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে পড়ব। কারণ, সে নিশ্চয়ই জানে, মেশিনের প্রোডাকশান বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে। কাজটা যদি করে উঠতে পারে, চাকরির বাজারে নাম হবে তার।"

ঝিনুক এবার গিয়েছিল দ্বিতীয় ধন্ধে, "সমীরণ দাস একেবারেই পছন্দ করেন না দেবাংশুবাবুকে। কুৎসা রটাতেও ছাড়েন না। উলটো

boierpathshala.blogspot.com

দিকে সূর্য রায় দেবাংশুবাবুর খুব ভক্ত।

প্রচুর গুণগান করলেন। এর থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়, দেবাংশুবাবুর সঙ্গে সমীরণ দাসের তিক্ত সম্পর্ক, মানে, মুখ দেখাদেখি নেই। আর সূর্য রায়ের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর। নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু দেবাংশুবাবু বলেছেন, দুই কম্পিটিটরের সঙ্গে তাঁর রিলেশন হ্যালো, হাই-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনজনের মধ্যে কে মিথ্যে কথা বলছেন?"

"ব্রিলিয়ান্ট। এক্সেলেন্ট।" বলে উঠলেন দীপকাকু।

ডবল কমপ্লিমেন্ট পেয়ে ঝিনুক পূর্ণোদ্যমে পরের বিশ্লেষণে গিয়েছিল, "সমীরণ দাস কী করে জানলেন, গ্রেটবাইটের মেশিন আপগ্রেড করছেন দেবাংশুবাবু? সম্ভবত বসন্ত আগরওয়াল বলেছেন। আমরা শুনেছি সমীরণবাবু গ্রেটবাইটের মেশিনে এক সময় কাজ করেছেন। রিলেশন আছে মিস্টার আগরওয়ালের সঙ্গে। দেবাংশুবাবু দশ লাখ ডিমান্ড করেছেন মেশিনের প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বাড়ানোর জন্য। দশের কমে যদি করা যায়, এই ভেবেই কি মিস্টার আগরওয়াল সমীরণ দাসকে বলেছেন, 'মেশিন আপগ্রেড যখন সম্ভব, আপনি করুন।' একইভাবে উনি যদি ভারতে ছড়িয়ে থাকা ইলেকট্রনিক সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ারদের উসকে থাকেন, তা হলে ধরে নিতে হবে দেবাংশুবাবুর ডায়াগ্রাম, স্পেয়ার পার্টস চুরি করার জন্য অনেকেই প্রলোভিত হয়েছে।"

"গুড অ্যানালিসিস," বলে উঠলেন দীপকাকু। তারপর বললেন, "তবে তোমার এই পয়েন্টটা আর-একটু স্পেসিফিক করে দিই। আমি নিশ্চিত, চোর কলকাতার কেউ। কারণ, বাইরের লোক দেবাংশুবাবুর অফিস, বাড়ির অন্দরমহলের খবর জানে না। কোন রুটে অফিস যান, ট্যাক্সিতে না প্রাইভেট কারে, এসব খোঁজ নিতে সময় লাগে। সেই সময়টা অন্য প্রদেশের লোক পায়নি। দেবাংশুবাবু অর্ডারটা পাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই উড়ে গিয়েছেন সিঙ্গাপুরে। জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন, তাও বেশিদিন হয়নি। এর মধ্যেই হয়ে গেল চুরি। সেটাও ঘটেছে কলকাতায়। বাড়ি এসে স্পেয়ার পার্টসগুলো দেখিয়েছিলেন স্ত্রীকে। অর্থাৎ চুরি হয়েছে বাড়িতে, অফিসে অথবা অফিস যাওয়ার পথে। শেষের আশঙ্কাটা কম, নিজের গাড়িতে অফিস যান দেবাংশু। ড্রাইভ করেন নিজেই। প্রথম যেদিন ব্যাগটা অফিসে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেদিনই দেখেছিলেন ব্যাগের জিনিসপত্র নেই। পথে কোথাও গাড়ি দাঁড় করাননি। আমার ধারণা, চুরিটা করেছে দেবাংশুবাবুর পরিচিত কেউ। দেবাংশুবাবুর বিষয়ে সমস্ত খবরই সে রাখে।"

"আপনার কি মনে হয়, আজ যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হল, চোর তাদের মধ্যেই কোনও একজন?" জানতে চাইল ঝিনুক।

দীপকাকু বললেন, "এখনই সেটা বলা সম্ভব নয়। জবর প্রমাণ কিছু পাইনি। কিছু অসঙ্গতি পেয়েছি।"

"যেমন?" জানতে চাইল ঝিনুক।

দীপকাকু বললেন, "সমীরণবাবুর কথা অনুযায়ী ডায়াগ্রাম চুরি যাওয়ার মিথ্যে অজুহাত খাড়া করে দেবাংশুবাবু কাজটা থেকে সরে যাবেন, তা কিন্তু নয়। ওরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ নকশা একটাই মাত্র কপি থাকবে, তা হতে পারে না। স্পেয়ার পার্টস কেনার সুবিধের জন্য এক কপি ডায়াগ্রাম হয়তো দেবাংশুবাবু সিঙ্গাপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন। আরও কপি অফিস বা বাড়ির কম্পিউটারে সেভ করা আছে। ডায়াগ্রাম হাতে পেলে চোরের লাভ হবে নিশ্চয়ই। দেবাংশুবাবুর ক্ষতি একটাই, নতুন করে স্পেয়ার পার্টস কিনতে যেতে হবে সিঙ্গাপুরে। এই ফাঁকে যদি কোনও ইঞ্জিনিয়ার ওঁরই নকশা থেকে মেশিন আপগ্রেড করে দেয়, পরিশ্রমটা বৃথা যাবে তাঁর। এই ঘটনা যদি না ঘটে, দেবাংশু এক মাসের মধ্যেই অর্ডার সাপ্লাই করে দিতে পারবেন। কোনও ক্ষতিই হবে না। এই সব পরিস্থিতি বিচার করে একজনকে আমরা সন্দেহের বাইরে রাখতে পারি। সে হচ্ছে তথাগত। যেহেতু দেবাংশুবাবুর পাসওয়ার্ড জানে, নকশা হাতানো কোনও ব্যাপার নয়। মিছিমিছি ডায়াগ্রাম চুরি করতে যাবে না।"

"স্পেয়ার পার্টসের জন্য চুরিটা করতে পারেন," বলেছিল ঝিনুক।

"না, ডায়াগ্রাম কম্পিউটার থেকে পেয়ে গেলে, স্পেয়ার পার্টস কিনে নিতে অসুবিধে হবে না। সিঙ্গাপুর একবার অবশ্য যেতেই হবে। লাখ-লাখ টাকার অর্ডারের তুলনায় সেই খরচা খুবই কম। স্পেয়ার পার্টসের দাম কিন্তু বেশি নয়। এই দেশে পাওয়া যায় না। এটাই যা সমস্যা।"

"তা হলে তথাগত কেন অর্ডারটা কত টাকার জেনেও চেপে গিয়েছিলেন?" জানতে চেয়েছিল ঝিনুক।

দীপকাকু প্রশংসার সুরে বলেছিলেন, "বাঃ, তুমি তো দেখছি কোনও ঘটনাই ভোলো না। ওয়েল, ওটা ছিল তথাগতর নেহাতই ছেলেমানুষী। চুরির দোষ যাতে ঘাড়ে এসে না পড়ে, তার জন্যই ওই দুর্বল অছিলা।"

"তা হলে তো একটা কাজ করা যায়, এখনই দেবাংশুবাবুকে ফোন করে জেনে নেওয়া যায়, ডায়াগ্রামের কপি ওঁর কাছে কি না?"

ঝিনুকের পরামর্শ কানে নেননি দীপকাকু। বলেছিলেন, "শোনো, আমি কিন্তু এখনও তথাগত ছাড়া কাউকেই সন্দেহের ঊর্ধ্বে রাখিনি। এর মধ্যে দেবাংশুবাবুও আছেন। যখনই ফোন করে জানতে চাইব, নকশার কপি আছে কি না? উনি যদি দোষী হন, সঙ্গে-সঙ্গে বলবেন, 'নেই।' সমীরণবাবুর কথামতো ফের ডায়াগ্রাম করার জন্য সময় চাইবেন কোম্পানির কাছে। এই ভাবে এগ্রিমেন্টের সময় পার করে নিজের 'মুখরক্ষা' করবেন। অতএব ডায়াগ্রামের কপি আছে কি না, খোঁজ নিতে হবে আমাকে অন্য রাস্তায়।"

দীপকাকুর বলা শেষ হতে বাবা বলেছিলেন, "এবার কি আমাকে বলার সুযোগ দেওয়া যাবে?"

আসলে হয়েছিল কী, জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শেষ করে ঝিনুক, দীপকাকু যখন বাড়ি ফিরেছিলেন, বাবা বলেছিলেন, "দু'জনের মুখ বলে দিচ্ছে, রহস্য সমাধানের হাজার মাইল দূরে আছ তোমরা, অথচ আমাকে দ্যাখো, অফিসে বসে ইন্টারনেট খুললাম। গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এখন আই টি-র যুগ হে। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে জেরা করা, মান্ধাতার আমলের ব্যাপার। তা হলে শোনো..."

তখনই বাবাকে আটকালেন দীপকাকু। বললেন, "আপনার চিন্তাভাবনা পরে শুনব। প্রথমে আমাদের ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে নিই। আগে যদি আপনার সমাধানের পথ শুনে ফেলি, আমরা খেই হারিয়ে ফেলব। আপনি তো কল্পনার সাহায্যে রহস্যটা উন্মোচন করবেন। আমাদের এগোতে হবে বাস্তবের পথ ধরে। কল্পনায় চোর ধরা অনেক সহজ।"

বাবা তখনকার মতো চুপ করে গেলেন। ঝিনুকদের কথাবার্তা শেষ হতেই শুরু করলেন, "আমার ধারণা, এই চুরির পিছনে কোনও আন্তর্জাতিক চক্র কাজ করছে।"

"এরকম মনে হওয়ার কারণ?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

বাবা বললেন, "তোমাদের কেসটা শোনার পর অফিসে গিয়ে ইন্টারনেট সার্চ করছিলাম। বিখ্যাত চুরির কেসে পাওয়া গেল আধুনিক টেকনোলজি-নির্ভর চোরের হাতিয়ার। জাপানের তৈরি এক আশ্চর্য জিনিস।"

"আবার জাপান?" সামান্য আগ্রহটুকুও হারিয়ে বললেন দীপকাকু।

জাপান দেশটার প্রতি বাবার পক্ষপাতিত্ব বড্ড বেশি। এর আগেও অনেকবার তার পরিচয় দিয়েছেন বাবা। এবার বললেন, "আমার কথাটা একটু শোনোই না।"

"আচ্ছা বলুন," বলে সোজা হয়ে বসলেন দীপকাকু। ঝিনুকও বাবার কথায় মন দিল। আর কিছু না হোক, চমকপ্রদ আইডিয়া কিছু শোনা যাবে।

বাবা বলতে শুরু করলেন, "জাপান এমন একটা হ্যান্ডি এক্স-রে ক্যামেরা আবিষ্কার করেছে, যে-কোনও তালার ভিতরের অংশের ছবি তোলা যায়। এবং সেই ক্যামেরার সঙ্গেই আছে অটোমেটিক চাবি তৈরির যন্ত্র। ক্যামেরাটা তালার গর্তের উপর রাখার মিনিটখানেকের ব্যবধানে চাবি বেরিয়ে আসবে যন্ত্র থেকে। বিদেশের অনেক চোর

boierpathshala.blogspot.com

আজকাল ওই ক্যামেরাসহ চাবি-মেশিন নিয়ে চুরি করতে বেরোচ্ছে। আমার ধারণা, ওরকমই কোনও ক্যামেরা-মেশিন দিয়ে খোলা হয়েছে দেবাংশুবাবুর ব্যাগ।"

দীপকাকু জানতে চাইলেন, "মেশিনটার কত দাম রজতদা?"

"দশ হাজার মার্কিন ডলার," উত্তর দিলেন বাবা।

দীপকাকু বললেন, "তার মানে, ধরুন, আমাদের টাকায় প্রায় সাড়ে চার লাখ। দেবাংশুবাবুর অর্ডার দশ লাখের। চোর যদি ওঁর জিনিসগুলো বিক্রি করতে যায়, পাঁচের বেশি পাবে না। তার জন্য সে সাড়ে চার লাখের মেশিন কিনবে?"

বাবা বললেন, "তোমাদের তো এখানেই গন্ডগোল! বড় করে কিছু ভাবতে পার না। তুমি কেন ধরে নিচ্ছ, দেবাংশুবাবুর আবিষ্কারের উপর শুধু দেশের ইঞ্জিনিয়ারদের নজর আছে, বিদেশিদেরও থাকতে পারে! তারা যদি কোনওভাবে খবর পায়, এক ভারতীয় ইতালির মেশিনটার প্রোডাকশন বাড়িয়ে দিচ্ছে, পিছনে পড়ে যাবে তারা।"

দীপকাকু গম্ভীরভাবে বললেন, "ভারত আর চিন ছাড়া বেশি প্রোডাকশনের মেশিন কোনও দেশেরই দরকার নেই। তাদের জনসংখ্যা আমাদের মতো বিপুল নয়। চিন টেকনোলজিতে স্বাবলম্বী। অন্য দেশের প্রযুক্তি চুরি করতে যাবে না।"

সেই যে বাবা চুপ করে গেলেন, কেস নিয়ে আর একটা কথাও বললেন না। রাতে শুতে যাওয়ার আগে ঝিনুককে বললেন, "সত্যিই দীপঙ্করের মেধা অসামান্য। লেগে থাক ওর সঙ্গে। বুদ্ধিচর্চা জীবনকে অনেক প্রাণবন্ত করে। দীপঙ্কর যে মাঝে-মাঝে দাবায় হেরে যায় আমার কাছে, আমাকে খুশি করার জন্যই হারে। কিন্তু কেসের ব্যাপারে ও কখনওই কোনও ধরনের হার মানতে রাজি নয়। নিজের চিন্তাভাবনার উপর ওর অগাধ বিশ্বাস।"

সকালের বৃষ্টি দেখে বাবা বললেন, "এ যা শুরু হল দেখছি, দুপুরের আগে ছাড়বে না। আজ ডুব মেরে দেব অফিসে। দীপঙ্কর এলে তোরা আমার গাড়ি নিয়েই যাস দেবাংশুবাবুর বাড়ি। এই ওয়েদারে মোটরসাইকেলে রাইড করা ঠিক হবে না। ওখান থেকে আবার কোথায় যেতে হয়..."

মিলিটারিতে কাজ করার সময় বাবা এত নিয়মশৃঙ্খলা মেনেছেন, এখন নিজের সিকিউরিটি এজেন্সিতে ইচ্ছেমতো যান।

গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে গেল, এদিকে দীপকাকুর দেখা নেই। বৃষ্টির প্রকোপ বুঝতে ঝিনুক জানলার কাছে গেল, দু'টো ভাল ঘটনা একসঙ্গে তার চোখে পড়ল, বৃষ্টি তো কমেই গিয়েছে, বর্ষাতিপরা দীপকাকু বাইক থামালেন গেটের সামনে।

বাবা ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ঝিনুক বলে উঠল, "এসে গিয়েছেন।"

কাগজ ভাঁজ করতে-করতে বাবা বললেন, "কে, দীপঙ্কর? ভালই হল। চ, আমিও তোদের সঙ্গে দেবাংশুবাবুর বাড়ি যাই। কেসটা আমারও খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে।"

ঝিনুকরা এখন দেবাংশুবাবুর বাড়িতে। গাড়িটা নিলেও বাবাকে সঙ্গে নিলেন না দীপকাকু। বললেন, "রজতদা, কেস এখন ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে গিয়েছে। এই সময় যদি আপনাকে সঙ্গে নিই এবং আপনি কল্পনানির্ভর কোনও পরামর্শ আমাদের দিতে থাকেন, পথভ্রষ্ট হব আমরা। আমি কথা দিচ্ছি কেসের শেষ দৃশ্যে আপনাকে উপস্থিত রাখব। তার আগেও আপনার থেকে অনেক কিছু জানার আছে আমার।"

হতোদ্যম হয়ে বাবা বললেন, "বলো, কী জানার আছে?"

"আপাতত একটা কথা বলুন, বিদেশের হোটেলগুলোয় সিকিউরিটি ব্যবস্থার ফাঁক কোথায়? মানে, আমি বলতে চাইছি একজন বোর্ডার যদি মনে করে অন্য বোর্ডারের রুমে ঢুকবে, সেটা কীভাবে সম্ভব?"

দীপকাকুর প্রশ্ন কপালে ভাঁজ পড়েছিল বাবার। সঠিক পাত্রকেই প্রশ্ন করলেন দীপকাকু। বাবা এক্স মিলিটারি-ম্যান। এখন আবার সিকিউরিটি এজেন্সির মালিক। একটু সময় নিয়ে বাবা বললেন, "বিদেশ বলতে তুমি যদি উন্নয়নশীল বা উন্নত দেশের কথা বলো, তাদের দামি হোটেলগুলোয় সিকিউরিটি ব্যবস্থা খুব টাইট। খুব দরকার ছাড়া রুম সার্ভিস পর্যন্ত দেওয়া হয় না। হোটেল কর্তৃপক্ষ ডুপ্লিকেট চাবি নিয়ে যে-কোনও রুমে ঢুকতে পারে। অন্য রুমের বোর্ডারের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। যদি না সে অন্য কোনও ধরনের পদ্ধতি নিয়ে থাকে।"

"সেটা কীরকম?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

বাবা বললেন, "ধরো, পাশের অথবা নীচের রুমের বোর্ডার দড়িতে আগুন লাগিয়ে, যে ঘরে ঢুকবে তার জানলায় ছুড়ে দিল। তারপর দড়ি বেয়ে চলে গেল সেই ঘরে।"

দীপকাকু মাথা নাড়লেন। বললেন, "না, এতটা ঝুঁকি নিতে পারে জিমন্যাস্টিকে দক্ষ কোনও লোক। এ ছাড়াও অনেক সমস্যা আছে। লোকে দেখে ফেলবে। আর কোনও কি রাস্তা নেই?"

ফের খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বাবা বললেন, "একটা রাস্তা আছে, সেটা তেমন প্রশস্ত নয়। কোনও বোর্ডার যদি মনে করে তার রুমটা সাফসুতরো করাবে, বাইরে বেরনোর সময় রুম বন্ধ করে একটা প্লেট ঝুলিয়ে দিয়ে যায়। তাতে লেখা থাকে, 'মেকআপ রুম'। ওই প্লেটটা সব রুমেই রাখা থাকে। মেকআপ রুমের প্লেট দেখে, ক্লিনিং স্টাফ হোটেলের চাবি দিয়ে দরজা খুলে পরিষ্কার করে বোর্ডারের ঘর। না হলে ওই রুমে কেউ ঢোকে না। এমন হতে পারে, অন্য রুমের বোর্ডার যদি চেষ্টা করে নির্দিষ্ট কোনও রুমে ঢোকার, তাকে অপেক্ষা করতে হবে ক্লিনিং স্টাফ ওই রুমে ঢোকা পর্যন্ত। সে ক্ষেত্রেও বাধা আছে, ক্লিনিং স্টাফ অন্য কাউকে সেই রুমে অ্যালাও করবে না। ঢুকতে গেলে ওই স্টাফকে মেরে অথবা অজ্ঞান করে ঢুকতে হবে।"

"ঘুষ। ক্লিনিং স্টাফকে ঘুষ দিয়েও তো ঢোকা যায়?" জিজ্ঞেস করলেন দীপকাকু।

বাবা বললেন, "তা যায়। তবে, আমাদের দেশে যেমন কথায়-কথায় ঘুষ দেওয়া হয়, বেশিরভাগ দেশেই তা হয় না।"

বাবার দেওয়া ইনফর্মেশন দীপকাকুর কতটা কাজে লাগল, এখনও জানে না ঝিনুক। বাবাকে একটা থ্যাঙ্কস জানিয়ে দীপকাকু বললেন, "এখন এইটুকু হলেই আমার চলবে। পরে আবার বসব আপনার সঙ্গে।" তারপর ঝিনুককে বললেন, "চলো, তোমাদের গাড়িতেই যাই। আকাশের উপর ভরসা নেই, আবার ঢালতে পারে।"

গাড়িতে করে দেবাংশুবাবুর বাড়ি আসার পথে ঝিনুক দীপকাকুকে জিজ্ঞেস করল, "সকালে কোথায় বেরিয়েছিলেন?"

দীপকাকু বললেন, "দু'টো জায়গায়। প্রথমে আফাংয়ের বাড়ি।"

প্রথমটা শুনেই ঝিনুক বিষম কৌতূহলে জিজ্ঞেস করল, "তাঁর বাড়ি গিয়ে কী হবে, কাল তো দেখলাম তালা ঝুলছে। আপনি বললেন, মিস্টার আফাংকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে অপরাধী।"

"তাও একটা চান্স নিলাম। যদি রাতে ফিরে সকালে বেরিয়ে যান। ভোর থাকতেই পৌঁছে গেলাম ওঁর বাড়ি।"

"পেলেন তাঁকে?"

"পেলাম। অনেক কথাও হল।"

দীপকাকুর কথা শুনে আর-এক প্রস্থ চমকে গেল ঝিনুক। জানতে চাইল, "কী বললেন উনি? কে গিয়েছিল চাবি নকল করাতে?"

"কেউ যায়নি। আত্মগোপনও করেননি আফাং। সন্ধেবেলায় এক বন্ধুর মৃত্যুর খবর এসেছিল। শেষকৃত্যে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। রাতেই ফিরে এসেছিলেন।"

দীপকাকুর কথার পর ঝিনুক বলল, "যাঃ, তা হলে তো আবার আমরা পিছিয়ে পড়লাম।"

"তা ঠিক বলা যায় না। আফাংয়ের সঙ্গে কথা বলে বেশ উপকার হয়েছে। এই কেসের ক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছি আমি।"

"কী কথা হল ওঁর সঙ্গে?"

ঝিনুকের প্রশ্নের উত্তর দীপকাকু বললেন, "এখন নয়, সময়মতো বলব।"

তারপর ঝিনুক দ্বিতীয় ব্যক্তির খোঁজ করল, "আর-একজনের কাছে গিয়েছিলেন বললেন?"

"হ্যাঁ, দেবাংশুবাবুর অফিসে গিয়ে তথাগতর সঙ্গে কথা বললাম।

boierpathshala.blogspot.com

জানতে চাইলাম, ডায়াগ্রামটার কপি আছে কি না? সে বলল, আছে।' তথাগতকে বলে এলাম, আমি যে অফিসে এসেছি, দেবাংশুবাবুকে যেন না বলে। বলছে, বলবে না। এবার দেবাংশুবাবু যদি বলেন, ডায়াগ্রাম একটাই ছিল, তা হলে বোঝা যাবে, চুরির নাটকটা দেবাংশুবাবুই সাজিয়েছেন।"

এর আগের কেসগুলোতেও ঝিনুক দেখেছে, দীপকাকুর কাজে কখনও কোথাও ফাঁকফোকর থাকে না। নির্দিষ্ট একটা ছক ধরে এগোন। যেন কাগজে ড্রয়িং করে নেন আগে। মানুষটাকে বাইরে থেকে দেখলে স্বভাবটার আন্দাজ পাওয়া যাবে না। খুবই অগোছাল থাকেন। আজ আবার যে জামাটা পরেছেন, বুকপকেটে কালির ধ্যাবড়া দাগ। ডটপেন থেকেও যে কী করে দীপকাকুর পকেটে কালি লিক করে, কে জানে!"

দোতলার এই ফ্ল্যাটে ঢুকে দীপকাকু নামমাত্র আলাপ সারলেন দেবাংশুবাবুর স্ত্রী পারমিতাদেবীর সঙ্গে। ঝিনুক স্পষ্ট দেখল পারমিতাদেবীর মুখে উৎসাহভঙ্গের ভাব। নিশ্চয়ই দীপকাকুর লুক দেখে তেমন ভরসা জাগেনি। দেবাংশুবাবু বললেন, "বাপনের মাকে আপাতত ছেড়ে দিয়েছি। আপনি ফোনে জানালেন ঘণ্টাদুয়েক দেরি হবে আসতে, ভাবলাম, ওকে আটকে রেখে কী লাভ। অন্য একটা বাড়ির কাজ সেরে আসুক।"

"এলেই হল!" বলে দীপকাকু এই ফ্ল্যাটটার ইঞ্চি-ইঞ্চি অংশজুড়ে চোখ বোলাতে লাগলেন। কিচেন, বাথরুম, ড্রয়িং, ডাইনিং দিনের দীপকাকু এখন দেবাংশুবাবুর বাড়ির ওয়ার্কশপে। দেবাংশুবাবুর স্ত্রী এই জায়গা পর্যন্ত আসেননি। এই ঘরে ঢুকেই ঝিনুকের চোখ থমকে গেল একটা জিনিসের উপর, সেই কালো বিদেশি ব্যাগ। যার ভিতর থেকে চুরি গিয়েছে দেবাংশুবাবুর ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, ডায়াগ্রাম। ব্যাগটা ফ্লোরের উপর দাঁড় করানো।

ঝিনুককে ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে, দেবাংশুবাবু বললেন, "সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে ব্যাগটা ঠিক যেভাবে রেখেছিলাম এই ঘরে, আপনাদের তদন্তের সুবিধের জন্য সেরকমভাবেই সাজিয়ে রেখেছি।"

কথাটা কানে গেলেও, দীপকাকু ব্যাগটার দিকে ঘুরেও তাকালেন না। দেবাংশুবাবুর কাজের টেবিলে বসে গত পনেরো-কুড়ি দিনের নিউজ়পেপার দেখে যাচ্ছেন। পেপারগুলো ঘরের কোণে একটা টুলের উপর রাখা ছিল। দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "নিউজ়পেপার কি আপনি এই ঘরে বসেই পড়েন?"

উত্তরে দেবাংশুবাবু বললেন, "না, কাগজ আমি ড্রয়িংয়ে বসে পড়ি। স্ত্রীকে বলেছি পুরনো পেপার এখানে জমা রাখতে। অন্তত এক মাসের। সকালে এত তাড়াহুড়োর মধ্যে কাগজ দেখি, সব খবর ভাল করে পড়া হয় না।"

দীপকাকুকে অত কাগজ নিয়ে বসতে দেখে দেবাংশুবাবু বললেন, "এসি-টা চালিয়ে দেব?"

দীপকাকু 'না' করে দিলেন। সত্যিই এসি-র দরকার নেই, বৃষ্টির জন্য ওয়েদার আজ বেশ ঠান্ডা। দেবাংশুবাবুর ফ্ল্যাটে ওয়ার্কশপেই শুধু এসি লাগানো। বাকি ঘরগুলোয় ফ্যান। দেবাংশুবাবুর মেশিনপত্রের জন্যই হয়তো এয়ারকন্ডিশনও বাধ্যতামূলক।

ঝিনুক এখনও বুঝতে পারছে না, দীপকাকু ওই কাগজগুলোর মধ্যে থেকে কোন বিশেষ খবরটা খুঁজছেন। এখন জিজ্ঞেস করা যাবে না, তদন্ত চলাকালীন প্রশ্ন করা বারণ। ঝিনুক ওয়ার্কশপটায় ভাল করে চোখ বোলাল। প্রচুর যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার, পি সি বি বোর্ড। সব কিছুই বেশ গুছিয়ে রাখা আছে। তুলনায় দেবাংশুবাবুর অফিসের ওয়ার্কশপ অনেক অগোছালো। মনে হয়, এই ঘরটাও পারমিতাদেবীর গোছানো। অন্য ঘরগুলোয় সুন্দর করে ডেকরেশন করা। দেওয়ালে পেন্টিং। ভদ্রমহিলার রুচি আছে। ওঁর পরনের হালকা সবুজ ঢাকাই শাড়ি, অল্প গয়না, হালকা প্রসাধন দেখেও সেটা বোঝা যায়। দেবাংশুবাবুর স্ত্রীকে দীপকাকু অনায়াসে সন্দেহের বাইরে রাখতে পারেন। এই মহিলার সঙ্গে যে লোহার যন্ত্রপাতির কোনও সম্পর্ক নেই, এটা বোঝার জন্য খুব বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। এই ফ্ল্যাটের আর-এক বাসিন্দা এই মুহূর্তে উপস্থিত না থাকলেও, অন্য ঘরগুলোয় স্কুলের বই, গল্পের বই, খেলনা, ড্রয়িংখাতা বলে দিচ্ছে, সে প্রবলভাবে আছে। দেবাংশুবাবুর চার বছরের ছেলে। তার একটা খেলনা বন্দুক ওয়ার্কশপেও দেখা গেল। ঝিনুক এক ফাঁকে পারমিতাদেবীকে জিজ্ঞেস করল, "আপনার ছেলেকে দেখছি না।"

"স্কুলে। ওদের মর্নিং সেকশন। এবার ফিরল বলে," বললেন পারমিতা।

দেবাংশুবাবুর বাড়িতে আসার পথে একটা স্টেশনারি দোকান দেখে ঝিনুক আঙুলকে গাড়ি দাঁড় করাতে বলল। দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার?"

ঝিনুক বলল, "দেবাংশুবাবুর ছেলের জন্য একটা চকোলেট-বার কিনব।"

"কেনো। কিন্তু আমি যখন দিতে বলব, তখনই দেবে। তার আগে নয়," বললেন দীপকাকু।

মনটা তেতো হয়ে গেল ঝিনুকের। দীপকাকুর কাজের জগৎটা এমনই, একটা বাচ্চাকে চকোলেট দেওয়ারও বিধিনিষেধ থাকে, বাচ্চাটা স্কুল থেকে ফিরবে কখন? ও এলে তদন্তের গুমোট ভাবটা একটু কাটে।

"চুরিটা মনে হচ্ছে এই ঘর থেকেই হয়েছে," কাগজগুলো থেকে মুখ তুলে বলে উঠলেন দীপকাকু।

বিষম বিস্ময়ে দেবাংশুবাবু বললেন, "তাই! কী করে বুঝলেন?"

ঝিনুকও খুব অবাক হল। দীপকাকু এরকমভাবে সিদ্ধান্তটা জানালেন, যেন নিউজ়পেপার ঘেঁটে এই খবরটাই পেলেন এতক্ষণে। দু'জনের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দীপকাকু তুলে ধরেছেন একটা ম্যাগাজিনের কভার। বললেন, "এর ভিতরের বইটা আপনার ব্যাগে অন্যান্য কাগজের সঙ্গে ছিল। সেখানে যে দু'টো ডেটের বাংলা, ইংরেজি মিলিয়ে চারটে নিউজ়পেপার দোমড়ানো অবস্থায় পাওয়া যায়, সেই ক'টা পেপার আপনার এই নিউজ়পেপার বান্ডিলে মিসিং। অর্থাৎ, এই ঘরে বসে ব্যাগের সমস্ত জিনিস বের করে, আপনারই কাগজ, ম্যাগাজিন দিয়ে বোঝাই করেছে ব্যাগ। ওর মধ্যে কিছু সিঙ্গাপুর টুরিজ়ম-এর ক্যাটালগ ছিল, যা সম্ভবত আপনারই। ওদেশ থেকে আনা। সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের একটা ম্যাগাজিন ছিল।"

দেবাংশুবাবু বললেন, "হতে পারে, জানেন। এবার তো সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে যাতায়াত করেছি। ম্যাগাজিন হাতে নিই বটে, পরে আর দেখা হয়ে ওঠে না। কিন্তু একটা ব্যাপার ভেবে আমি অবাক হচ্ছি, এই ঘরে ঢুকল কী করে। শুধু ঢোকেইনি, বেশ কিছুক্ষণ সময়ও কাটিয়েছে। ব্যাগ থেকে জিনিসপত্র বের করা, কাগজ ঢোকানো, ব্যাগটা আগের জায়গায় রাখা, নিজের ব্যাগে বা ঝোলায় জিনিসগুলো ভরে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া, এত কাজ করল কখন? ব্যাগটা খুললই বা কী করে?"

"এসব জানার জন্য আপনার বাড়ির লোককেও জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার। চলুন, সেরে ফেলি," বলে, চেয়ার থেকে উঠে এলেন দীপকাকু।

ঝিনুকরা ড্রয়িংরুমে এসে বসেছে। অন্য বাড়ির কাজ সেরে ফিরে এসেছে বাপনের-মা। আর-একজনও ফিরেছে স্কুল থেকে, এতটুকু সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। মা'র হাত ধরে দাঁড়িয়ে জ্বলজ্বল করে ঝিনুককে দেখছে। ভীষণ সুইট দেখতে দেবাংশুবাবুর ছেলেকে। চোখে-মুখে দুষ্টুমি ভর্তি। মা কিছু একটা বুঝিয়েছেন, তাই চুপ করে আছে এখন। বাচ্চাটাকে ডেকে চকোলেট দিতে ইচ্ছে করছে ঝিনুকের, নামটাও জেনে নেওয়া যাবে সেই ফাঁকে। কিন্তু উপায় নেই, চকোলেট দেওয়ার আগে পারমিশন নিতে হবে দীপকাকুর।

"তুমিই বাপনের-মা? আসল নাম কী?" দীপকাকুর জেরা শুরু হল।

বাপনের-মা'র বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে। মাথা নেড়ে বলল, "নাম লক্ষ্মী বেরা।"

boierpathshala.blogspot.com

"বাপন এখন কী করে?" প্রশ্নটা এমনভাবে করলেন দীপকাকু, বাপন যেন তাঁর চেনাজানা কেউ।

লক্ষ্মী বেরা বলল, "একটা গ্রিল কারখানায় কাজ করে, বাবু।"

"তুমি এই বাড়ির ওয়ার্কশপটাও ধোওয়ামোছা করো তো?"

লক্ষ্মী বেরা উত্তর দিতে পারল না। দেবাংশুবাবু হেল্প করলেন, "আমার কাজের ঘরের কথা বলছেন।"

ওয়ার্কশপের মানে বুঝতে পেরে লক্ষ্মী বেরা সহজ হল। বলল, "করি বাবু। গোটা ফ্ল্যাটটা আমিই তো ধোওয়ামোছা করি।"

"কোন ব্যাগ থেকে বাবুর যন্ত্রপাতি চুরি হয়েছে জানো?"

"জানি। ব্যাগটা আমি হাত দিয়ে তুলে মেঝে পরিষ্কার করেছি। বাবুর ঘরের জিনিস একটুও এদিক-ওদিক করি না। যেখানকার জিনিস সেখানেই রাখি।"

লক্ষ্মী বেরার উত্তরের পর দীপকাকু বললেন, "এই যে এ বাড়ি থেকে জিনিস চুরি হল, তোমার ভয় করেনি, পুলিশ এসে জেরা করবে, থানায় নিয়ে যাবে?"

"করেনি আবার? চুরি হয়েছে শোনার পর দু' রাত ঘুমোতে পারিনি। বউদির কাছে এসে কেঁদেছি। বউদিই আমাকে সাহস দিলেন। বললেন, 'তুমি যদি অন্যায় না করে থাকো, ভয় পাচ্ছ কেন? আমি তোমার সঙ্গে আছি।' "

লক্ষ্মী বেরার কথা শেষ হতেই ঝিনুকের চোখ গেল পারমিতাদেবীর দিকে। মহিলা শুধু সুরুচিসম্পন্না নন, সু-মনেরও অধিকারিণী। ঝিনুকের সঙ্গে চোখাচোখি হতে পারমিতা বললেন, "বাপনের-মা সত্যিই খুব বিশ্বাসী লোক। এ পাড়ায় ছ'বাড়িতে কাজ করে, একটু-আধটু কামাই ছাড়া আর কোনও বদনাম নেই।"

পারমিতাদেবীর দিকে তাকিয়ে দীপকাকুও কথাটা শুনলেন। তারপর ইশারায় ডাকলেন মা'র হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকা এ বাড়ির কনিষ্ঠ সদস্যটিকে। একটুও ইতস্তত না করে ছেলেটি চলে এল দীপকাকুর সামনে। দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী?"

"সাম্য, সাম্য সেনগুপ্ত। বাড়ির নাম সমু," স্পষ্ট উচ্চারণে বলল পারমিতাদেবীর চার বছরের ছেলে।

ঘরের কোণে বড় আলমারিটার দিকে তাকিয়ে দেবাংশুবাবুর উদ্দেশে দীপকাকু বললেন, "ওই আলমারির লকারেই ছিল ব্যাগের চাবি?"

দেবাংশুবাবু বললেন, "হ্যাঁ, ওটাতেই ছিল।"

"আলমারির চাবিটা একবার দেখি।"

দীপকাকুর নির্দেশ মেনে চাবির গোছা আলমারির মাথা থেকে এনে দিলেন পারমিতা। দীপকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "এর মধ্যে লকারের চাবিটা আছে তো?"

ঘাড় হেলিয়ে "হ্যাঁ" বললেন পারমিতা।

দীপকাকুর এবার সাম্যকে বললেন, "তোমার চকোলেট, খেলনা কোথায় লুকিয়ে রাখেন মা, যেটা নিয়ে তুমি জেদ করো?"

সাম্য আলমারির দিকে আঙুল তুলল। দীপকাকু চাবির গোছাটা সাম্যর হাতে দিয়ে বললেন, "যাও, আলমারির কোথায় মা চকোলেট বা খেলনা রাখেন, দেখাও।"

সাম্য চাবি নিয়ে চলল আলমারির দিকে। এক নম্বর, দু' নম্বর করে দু'টো চাবি লাগে এই ধরনের আলমারি খুলতে। দিব্যি খুলে ফেলল ওইটুকু ছেলে! লোয়ার র‍্যাকে পা রেখে লকার পর্যন্ত খুলল। বের করে আনল চকোলেটের প্যাকেট। এগিয়ে এসে দীপকাকুর কাছে দাঁড়াল।

দেবাংশুবাবু বলে উঠলেন, "স্ট্রেঞ্জ। ও আলমারির লকার পর্যন্ত খুলতে পারে?"

পারমিতাদেবী অপরাধীর কণ্ঠে বললেন, "এক-একসময় এত বায়না করে, আমাকে ওগুলো লকারেই রাখতে হয়।"

"রেখে কোনও লাভ নেই, দেখলেন তো। এখন কে বলতে পারে, লকার থেকে চাবি বের করে ও কাউকে দেয়নি?" বললেন দীপকাকু।

দেবাংশুবাবু রেগেমেগে এগিয়ে এলেন সাম্যর কাছে, একটু ঝুঁকে ছেলের কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে জিজ্ঞেস করলেন, "বল, কাকে দিয়েছিস চাবি? বল?"

দেবাংশুবাবুর হাত সরিয়ে দিয়ে দীপকাকু বললেন, "এভাবে জোর করলে বলবে না। বলার হলে নিজে থেকেই বলবে।"

বাবার বকুনিতে সাম্যর চোখে জল। মা'র কাছে এগিয়ে গেল, চকোলেটের প্যাকেটটা তুলে দিল হাতে। ঝিনুকের উদ্দেশে দীপকাকু বলে উঠলেন, "কী হল, তুমি যে ওর জন্য চকোলেট আনলে, সেটা দাও।"

কোনও-কোনও কথা দীপকাকু ভীষণ রং ডেলিভারি করেন। যে ভঙ্গিতে চকোলেটটা দিতে বললেন, মনে হল, যেন ঝিনুক জিনিসটা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। অথচ নিজেই বলেছিলেন, "আমি না বলা পর্যন্ত দেবে না।"

ঝিনুক সোফা থেকে উঠে গিয়ে সাম্যকে চকোলেট-বারটা দিল। জলভরা চোখে সাম্য "থ্যাঙ্ক ইউ" বলতে ভুলল না। ঝিনুক এটা অবশ্য বুঝতে পারছে, কেন দীপকাকু চকোলেটটা প্রথমেই দিতে বারণ করেছিলেন। ছেলেটিকে দিয়ে আলমারি খোলানোর প্ল্যান আগেই ভাবা ছিল। ঝিনুকের থেকে চকোলেট পেয়ে গেলে, সাম্যর হয়তো আলমারি খোলার আগ্রহ হত না। দীপকাকুর পূর্ব-পরিকল্পনাকে স্যালুট করতেই হয়।

দেবাংশুবাবু খুবই ভেঙে পড়লেন। কপালে হাত দিয়ে বসে থাকলেন সোফায়। স্বগতোক্তির ঢঙে বললেন, "শেষমেশ আমার ছেলের হাত দিয়েই এত বড় অঘটনটা ঘটে গেল।"

দীপকাকু বললেন, "এখনই এটা ধরে নেওয়ার সময় আসেনি। তদন্ত আরও এগোক, তারপর নিশ্চিত হওয়া যাবে। আপনি এখন আমায় বলুন, সিঙ্গাপুরে কোন হোটেলে উঠেছিলেন?"

তদন্তের মোড় অন্য দিকে ঘুরে যাচ্ছে দেখে, একটু বুঝি চাঙা হলেন দেবাংশুবাবু। বললেন, "গত চারবার আমি হোটেল 'গ্র্যান্ডম্যাঙ্গ'-এ উঠেছি। হোটেলটা কমদামি। সেজন্যই যে ওখানে উঠি তা নয়, অন্য অনেক সুবিধেও আছে।"

"যেমন?" জানতে চাইলেন দীপকাকু।

দেবাংশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি কখনও সিঙ্গাপুর গিয়েছেন?"

"না।"

"ওখানে 'লিটল ইন্ডিয়া' বলে একটা জায়গা আছে। নাম শুনেই বোঝা যাচ্ছে ওই অঞ্চলটায় আমাদের দেশের লোকের বসবাস বেশি। একটা পার্ক আছে, যেখানে প্রতিদিন ছোটমতো বাজার বসে। 'লিটল ইন্ডিয়া বাজার' বলে অনেকে। পুরনো জিনিসপত্র বিক্রি হয়। যদিও বিক্রেতারা কেউই ভারতের নয়। বেশিরভাগই চাইনিজ। ওই পার্কের কাছেই আমার হোটেল। পার্ক পেরোলেই ইলেকট্রনিক মল, সিমলিম স্কোয়ার আর সিমলিম টাওয়ার। হোটেল থেকে ওয়াকিং ডিসট্যান্স। তারপর ধরুন, মুস্তাফা শপিং মল। কী পাওয়া যায় না ওখানে? কসমেটিক থেকে ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেটস। জুতো, জামাকাপড়, সব। সিঙ্গাপুর বেড়াতে গিয়ে ইন্ডিয়ান, বাংলাদেশিরা ওখান থেকেই শপিং করে। আমার হোটেলের উলটো দিকে বাংলাদেশি রেস্তরাঁ আছে। দিব্যি মাছ-ভাত পাওয়া যায়। দামও বেশ সস্তা। এই সব কারণেই আমি লিটল ইন্ডিয়ায় থাকা পছন্দ করি।"

একটানা কথা বলে থামলেন দেবাংশুবাবু। হঠাৎ কী মনে পড়তে বললেন, "দাঁড়ান, আমার একটা ছোট ডিজিটাল স্টিল ক্যামেরা আছে, সেটা দিয়ে এবার সিঙ্গাপুরের কিছু ফোটো তুলেছিলাম। লিটল ইন্ডিয়ায় ছবি, দেখাচ্ছি।"

দেবাংশুবাবু উঠছিলেন ফোটো আনতে, পারমিতা বললেন, "তুমি বোসো, আমি এনে দিচ্ছি।"

ঝিনুক দেখল, ঘর ছেড়ে কখন যেন বেরিয়ে গিয়েছে বাপনের-মা! সাম্য দূরে কর্নারে বসে মনযোগ সহকারে খারাপ একটা খেলনা গাড়ি জবরদস্তি চালানোর চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে ব্যাটারি ফুরিয়েছে গাড়িটার।

boierpathshala.blogspot.com

পারমিতা চার বাই ছ'য়ের ফোটো অ্যালবাম নিয়ে এলেন। ফোটো দেখা শুরু হল। দৌড়ে এল সাম্য। দেবাংশুবাবু দেখাতে লাগলেন যেসব জায়গার কথা বললেন এতক্ষণ। হোটেলের জানলা দিয়ে অনেক ফোটো তুলেছেন। ফোটো তোলার হাতটা নেহাত মন্দ নয়। দীপকাকু বললেন, "ফোটোর অ্যালবামটা কি ক'দিনের জন্য রাখতে পারি?"

"রাখুন না, কোনও অসুবিধে নেই," সাগ্রহে সম্মতি দিলেন দেবাংশুবাবু।

দীপকাকু অ্যালবামটা প্যান্টের পকেটে পুরে নিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "ডায়াগ্রাম, স্পেয়ার পার্টস ভর্তি ব্যাগ হোটেলের রুমে রেখে বাইরে গিয়েছিলেন কখনও?"

"বহুবার গিয়েছি। ওখানে তো রুম সার্ভিস নেই। হোটেলের উলটো দিকের ফুটপাতে চা-দোকান। সকালে চা খেতে গিয়েছি। লাঞ্চ বা ডিনারের জন্য দু'-চারবার গিয়েছি বাংলাদেশি হোটেলটায়। কখনও বা শপিং করে, খেয়ে ঢুকেছি।"

দীপকাকু বললেন, "খাওয়াটাওয়ার জন্য তো বেশি সময় লাগার কথা নয়। ঘণ্টা দেড়- দু'য়ের জন্য বাইরে ছিলেন কখনও, যখন ব্যাগ এবং চাবি রুমের ভিতরে?"

একটু ভেবে দেবাংশুবাবু বললেন, "এরকম ঘটেছে মাত্র একবার। যেদিন ফিরব, তার আগের সন্ধেয় মুস্তাফা সেন্টারে শপিং করতে গিয়েছিলাম। ঘণ্টাচারেক ওই শপিং মলে কাটাই। আত্মীয়স্বজনদের জন্য কিছু কেনাকাটা করি। বুঝতেই তো পারছেন, বিদেশে গেলে রিলেটিভরা কিছু না-কিছু এক্সপেক্ট করে।"

"মুস্তাফা সেন্টারে যাওয়ার আগে নিজের রুমটা কি 'মেকআপ' করতে দিয়ে গিয়েছিলেন? ওই হোটেলে 'মেকআপ রুম'-এর বোর্ড নিশ্চয়ই ছিল?"

দেবাংশুবাবু বললেন, "ছিল, তবে রুম ক্লিন করতে আমি একবারই দিয়েছিলাম। যেদিন পৌঁছই, তার পরের দিন। তখন ঘরে ব্যাগ, স্পেয়ার পার্টস কিছুই ছিল না। কারণ, সেগুলো কিনতেই গিয়েছিলাম সিমলিম টাওয়ার এবং স্কোয়ারে।"

কথা শেষ করে দেবাংশুবাবু ফিরতি প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, আপনি হোটেলের ইনফর্মেশন এত নিচ্ছেন কেন? আমি তো বাড়ি ফিরে স্পেয়ার পার্টস, ডায়াগ্রাম সবই দেখেছি, ব্যাগেই ছিল।"

"ডায়াগ্রামের কোনও কপি আছে আপনার কাছে?"

"আছে," বললেন দেবাংশুবাবু।

ঝিনুক লক্ষ করল, দীপকাকু সযত্নে দেবাংশুবাবুর করা 'হোটেল' নিয়ে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন। এখন জিজ্ঞেস করলেন, "মুস্তাফা সেন্টারে শপিং করতে যাওয়ার সময় ব্যাগের চাবি দু'টো কোথায় রেখেছিলেন?"

"বিদেশে গেলে আমি সব সময় কাঁধে একটা ছোট চামড়ার ব্যাগ রাখি। যেটায় পাশপোর্ট, ভিসা, ফ্লাইটের বোর্ডিং পাস থাকে। চাবিটা রেখেছিলাম ওই ব্যাগেই।"

"ব্যাগটা শপিং করতে যাওয়ার সময় নিয়ে বেরোননি?"

"না, মুস্তাফা সেন্টারে যা ভিড় হয়, হারিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। তার চেয়ে হোটেলের রুম সেফ।"

"সিঙ্গাপুরের টিকিট আপনি কোন ট্র্যাভেল এজেন্টকে দিয়ে বুক করান?"

"থিয়েটার রোডে 'সান ট্র্যাভেলস'। প্রতিবার ওরাই আমার টিকিট ভিসা করে দেয়। একটা ফোন করে নিতাইয়ের হাত দিয়ে কাগজপত্র পাঠিয়ে দিই।"

দীপকাকু বললেন, "হ্যাঁ, নিতাই আমাকে বলেছে। আচ্ছা, এবার আমাকে একটা জিনিস লিখে দিন, কবে কত নম্বর ফ্লাইটে গিয়েছেন এবং ফিরেছেন।"

"আমি আপনাকে বোর্ডিং পাসও দিতে পারি। লাস্ট জার্নির বোর্ডিং পাস আমার পাশপোর্টের সঙ্গেই থাকে," বললেন দেবাংশুবাবু।

দীপকাকু বললেন, "তাই দিন। ট্র্যাভেল এজেন্টের ফোন নম্বরটাও লিখে দেবেন।"

দেবাংশু উঠে গেলেন বোর্ডিং পাস আনতে। কথাবার্তার ফাঁকে পারমিতাদেবী কিচেনে গিয়ে চা বানালেন। ট্রেতে চা আর স্ন্যাক্স নিয়ে এসে সেন্টার টেবিলে রাখলেন। অফার করার আগেই দীপকাকু চায়ের কাপ তুলে নিয়ে পারমিতাকে বললেন, "এবার আপনাকে ক'টা কথা জিজ্ঞেস করব।"

"নিশ্চয়ই করুন," উলটো দিকের সোফায় বসতে-বসতে বললেন পারমিতা।

দীপকাকু শুরু করলেন, "আপনার ছেলে আশপাশের ফ্ল্যাটে যায়?"

"না। আমাদের এই কমপ্লেক্সে নেমন্তন্ন ছাড়া কেউ কারও ফ্ল্যাটে ঢোকে না। যে-যার নিজের মতো থাকে।"

দীপকাকুর পরের প্রশ্ন, "আপনাদের আত্মীয়স্বজনরা এই বাড়ির ওয়ার্কশপটা দেখেছে? ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন কাদের-কাদের?"

পারমিতাদেবী বললেন, "সমুর অন্নপ্রাশনের সময় অনেকেই দেখেছে। ছাদে খাওয়ানো হয়েছিল, রিসেপশন হয়েছিল ফ্ল্যাটে। তখন সবে ওয়ার্কশপটা সাজানো হয়েছে, দেবাংশু গেস্টদের ধরে-ধরে নিয়ে গিয়েছে ওয়ার্কশপটা দেখাতে। নিমন্ত্রিত ছিল প্রচুর। ওর ট্রেডেরও অনেক লোক ছিল।"

দেবাংশুবাবু বোর্ডিং পাস নিয়ে এলেন। সোফায় বসে অপরাধীর গলায় বললেন, "তা হলে কি আমাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ? ঘরটা দেখানোই ভুল হল!"

"আপনি এখন কোনও কমেন্ট করবেন না," বলে দীপকাকু বোর্ডিং পাস এবং সাদা কাগজে লেখা ট্র্যাভেল এজেন্টের ঠিকানাটা দেবাংশুবাবুর থেকে নিয়ে বুক পকেটে রাখলেন। ফের পারমিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি, বাপনের মা আর দেবাংশুবাবু ছাড়া ওয়ার্কশপে আর কার-কার যাতায়াত আছে?"

"সমু তো হামেশাই ঢুকে যায়। এ ছাড়া তথাগত, নিতাই ঢোকে, দেবাংশু অফিসে বসে ওদের এটা-সেটা আনতে পাঠায়।"

"এ ছাড়া আর কেউ কি সম্প্রতি ওই ঘরে ঢুকেছিল?"

পারমিতাদেবী একমনে ভাবতে থাকলেন। হঠাৎ মনে পড়েছে এই ভাবে বলে উঠলেন, "ও হ্যাঁ, গত সপ্তাহে ওয়ার্কশপের এসি-টা সার্ভিসিং করতে এসেছিল একজন।"

"আপনারা কি সার্ভিস করতে ডেকেছিলেন?"

"আমি ডাকিনি। দেবাংশু এসি কোম্পানিকে ফোন করেছিল।"

পারমিতাদেবীর কথা শুনে দেবাংশুবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, "আমি। না, এ সি কোম্পানিকে আমি তো কোনও ফোন করিনি। তা ছাড়া ও ঘরে ঠান্ডা তো ভালই হচ্ছে। হঠাৎ সার্ভিস করতে ডাকব কেন?"

দীপকাকু স্বগতোক্তির ঢঙে বললেন, "চুরিটা তার মানে তখনই সারা হয়েছে।" পারমিতাদেবীকে জিজ্ঞেস করলেন, "যখন এসি-টা সার্ভিস করছিল, আপনি ওয়ার্কশপে ছিলেন?"

"মেশিনটা খুলতে দেখে আমি সরে এসেছি। লোকটা নিজের মতো কাজ করে। যাওয়ার সময় আমাকে বলে চলে গিয়েছে," বললেন পারমিতা।

দীপকাকু দেবাংশুবাবুকে বললেন, "এসি-র ডিলারকে ফোন করুন, রিসেন্টলি কোনও লোক পাঠিয়েছিল কি না আপনার বাড়িতে।"

দেবাংশুবাবু এই মুহূর্তে যথেষ্ট উত্তেজিত এবং অস্থির। পকেট থেকে সেলফোন বের করলেন, ঠিকমতো বোতাম টিপতে পারছিলেন না। সোফা ছেড়ে উঠে একটু দূরে সরে গেলেন। দীপকাকু পারমিতাদেবীকে জিজ্ঞেস করলেন, "এসি সার্ভিস করতে আসা লোকটার চেহারা মনে আছে?"

অসহায়ভাবে মাথা নাড়লেন পারমিতা। বললেন, "একটুও মনে করতে পারছি না। অন্য সব মুখ চলে আসছে চোখের সামনে। যেমন, গ্যাস ডেলিভারি-ম্যান, কুরিয়ার সার্ভিসের লোক, কেবল টিভি-র

boierpathshala.blogspot.com

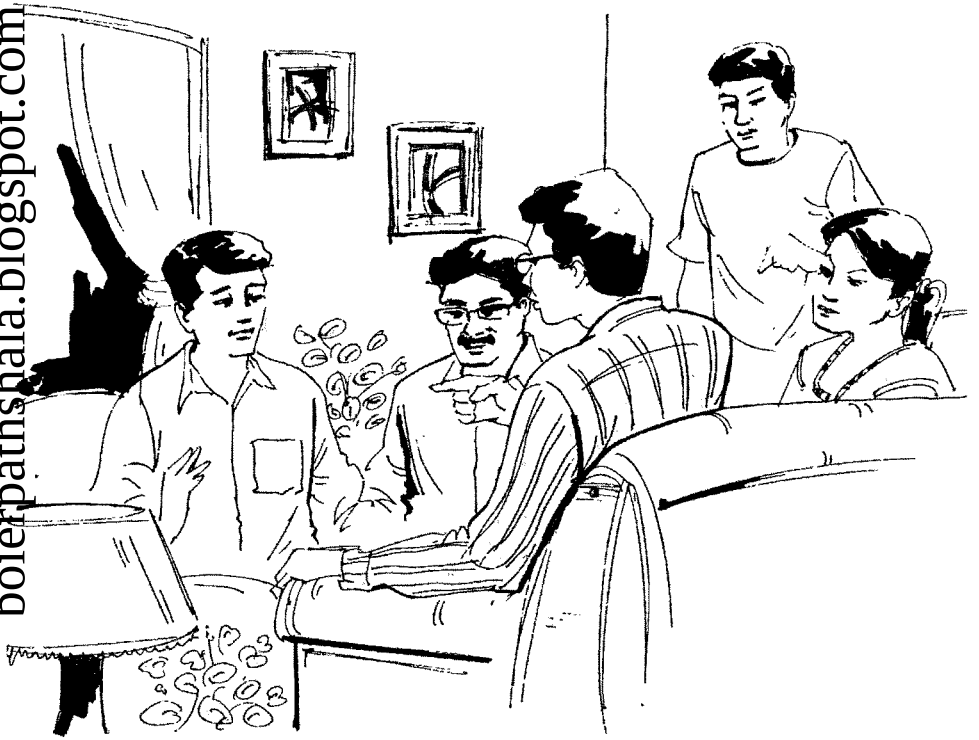

টাকা নিতে আসে যে ছেলেটা...”

দীপকাকু বললেন, “অত টেনশন করে ভাবতে হবে না। এ বাড়িতে আসে-যায়, সেরকম মুখগুলো এক-এক করে ভাবতে থাকুন, চট করে দেখবেন, ওই মুখটা মনে পড়ে গিয়েছে।”

দেবাংশুবাবুর ফোন করা হয়ে গিয়েছে। এগিয়ে এসে বললেন, “না, ওরা কোনও লোক পাঠায়নি। সম্প্রতি যাদবপুর অঞ্চলে কোনও সার্ভিস হয়নি ওদের। ঠিকানা ভুল করে যে আমাদের বাড়িরটা করে যাবে, তার সম্ভাবনাই নেই।”

মেঝের দিকে তাকিয়ে নীচের ঠোঁট উলটে কিছুক্ষণ ধরে কীসব চিন্তা করলেন দীপকাকু। মাথা তুলে বললেন, “ঠিক আছে। আমি ফোন করে দিচ্ছি, ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি থেকে দু'-তিনজন আসবে আপনাদের বাড়িতে। এয়ারকন্ডিশন মেশিনের গায়ে আছে অপরাধীর হাতের ছাপ। ওরা তার ছবি তুলবে। আশা করি, এই কয়েক দিনের মধ্যে আপনি এসি মেশিনের বডি ক্লিন করেননি।”

“না, করা হয়নি। খুব কমই করা হয়। বাপনের- মা'র হাত যায় না অত উঁচুতে,” বললেন পারমিতাদেবী।

দীপকাকু পারমিতাদেবীর উদ্দেশে বললেন, “আগামীকাল পোর্ট্রেটে জন্য একজন আর্টিস্ট আসবে আপনার কাছে। সার্ভিস করতে আসা লোকটার মুখ কালকের মধ্যে নিশ্চয়ই মনে পড়ে যাবে আপনার। মুখে-মুখে তারই বর্ণনা দেবেন, আর্টিস্ট তখনই এঁকে নেবে।”

“এঁরা কি সব পুলিশের লোক? আপনারা কেউ থাকবেন না?” সন্ত্রস্ত হয়ে জানতে চাইলেন পারমিতা।

দীপকাকু বললেন, “পুলিশ হলেও চিন্তার কিছু ছিল না। তবে ফরেন্সিক ল্যাবটা প্রাইভেট। আর্টিস্ট কোনও চাকরি করে না। ইয়ং, ট্যালেন্টেড ছেলে। আমার সঙ্গে বেশ ক'টা কাজ সাকসেসফুলি করেছে।”

দেবাংশুবাবু জানতে চাইলেন, “আপনার সঙ্গে পরে কীভাবে যোগাযোগ হবে?”

“আপনার প্রয়োজনে আপনি ফোন করবেন। আমিও দরকার অনুযায়ী করে নেব,” বলে, সোফা থেকে উঠে সোজা দরজার দিকে হাঁটা দিলেন দীপকাকু।

ঝিনুক অনুসরণ করতে গিয়ে একবার পিছন ফিরল সাম্যর জন্য। সাম্য খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। মিষ্টি হেসে টা-টা করছে ঝিনুককে। ঝিনুকও হাত নাড়ল। এই বাড়ির কেস যতই জটিল এবং ঝামেলার হোক না কেন, এই বাচ্চাটির হাসির সরলতা এতটুকু কেড়ে নিতে পারেনি।

boierpathshala.blogspot.com

॥ ৪ ॥

গতরাতে ঝিনুক একটা আজব স্বপ্ন দেখেছে। বাবা, মা, দীপকাকুর মধ্যে কাউকেই বলা যাবে না স্বপ্নটার কথা, হাসাহাসি করবেন তিনজনেই। স্বপ্নটা ভেবে এখন নিজের মনেই হাসছে ঝিনুক। স্বপ্নের সময়টা ছিল দুপুর। বাড়ির বারান্দায় বসে আছে ঝিনুক। চাবিওলার গলা পাওয়া যাচ্ছে। "চাবি করাবে, চাবি? তালা খোলাবে, তালা?" এই হাঁকের মধ্যেই একরাশ চাবির ঝনাৎ-ঝনাৎ শব্দ। চাবি তৈরির ফেরিওয়ালা আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। ঝিনুক যখন ছোট, এ পাড়ায় তাদের হামেশাই দেখা যেত। এক হাতে ধরে থাকত তারের রিং, তাতে ঝুলছে অজস্র চাবি। হাতটা ওঠানামা করে আওয়াজ তুলত। আর ঘাড়ে থাকত ছোট কাঠের বাক্স। যন্ত্রপাতি থাকত সেটায়। অন্য হাত দিয়ে ধরে থাকত বাক্সটা। ছেলেবেলায় ঝিনুকের মনে হত, এরাই হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে সৎ লোক। ইচ্ছে করলেই প্রচুর ধনরত্নের মালিক হতে পারে, সমস্ত সিন্দুকের চাবি তৈরির কৌশল এদের জানা। তবু সেসব খারাপ পথে যায় না। ধুলোমলিন পোশাক পরে ঘুরে বেরায় পাড়ায়-পাড়ায়, গৃহস্থের হারিয়ে যাওয়া চাবির বন্ধ তালা খুলে দেয়। তৈরি করে দেয় নতুন চাবি।

স্বপ্নে ছেলেবেলার ফেরিওয়ালা ফিরে এসেছিল হাঁক এবং চাবির আওয়াজসমেত। গেটের সামনে দিয়ে যখন যাচ্ছে লোকটা, ঝিনুক ডেকে উঠেছিল, "ও চাবিওয়ালা।"

চকিতে ঝিনুককে দেখে নিয়ে চাবিওয়ালা বড়-বড় পা ফেলে এগিয়ে যেতে থাকল। কীরকম যেন সন্দেহ হল ঝিনুকের। দৌড়ে গিয়ে গেট খুলে রাস্তায় দাঁড়াল। লোকটা হাঁটার ছন্দে ততক্ষণে দৌড় শুরু করে দিয়েছে। ঝিনুকও একই ছন্দে অনুসরণ করতে থাকল। লোকটা আর-একবার পিছন ফিরে ঝিনুককে দেখেই দৌড় শুরু করল। হাতের জিনিসপত্র রাস্তার ধারে ফেলে দিল। মুখটা খুবই চেনাচেনা লাগল ঝিনুকের। লোকটাকে ছাড়লে চলবে না। স্প্রিন্ট টানতে থাকল ঝিনুক। অচিরেই ধরে ফেলবে। ক্যারাটে এবং দৌড়ের প্র্যাক্টিস নিয়মিত চালিয়ে যায় ঝিনুক। স্বপ্নের চেঞ্জে বলেই লোকটাকে ধরা যাচ্ছিল না। ফুট চার-পাঁচের ব্যবধান থেকেই যাচ্ছিল। এক সময় একটা ফলের ঠেলাগাড়িতে সজোরে ধাক্কা খেল লোকটা। গাড়িটা নিশ্চয়ই ঝিনুকের দেখা সিনেমা-স্মৃতি থেকে উদয় হয়েছিল। লোকটা ফুটপাতে চিতপাত। ঝিনুক হাঁফাতে-হাঁফাতে সামনে যেতেই রীতিমতো চমকে উঠল, এ কার চেহারা দেখছে সে? মুখটা সমীরণ দাসের। জামা নিতাইয়ের। একটা হাত দেবাংশুবাবুর, চেনা গেল বিদেশি ঘড়িটা দেখে। অন্য হাত সম্ভবত সূর্য রায়ের, আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। প্যান্ট, জুতো অবধারিত তথাগতর... বিপুল বিভ্রান্তি নিয়ে ঘুম ভেঙেছিল ঝিনুকের। নিজেকে আবিষ্কার করেছিল মশারি জড়ানো অবস্থায় বিছানায়। কখন এবং কীভাবে যে মশারির দড়ি ছিঁড়ে ফেলেছিল কে জানে।

এরকম উদ্ভট স্বপ্ন দেখার যথেষ্ট কারণ আছে। গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত দেবাংশুবাবুর কেসটা নিয়ে ভেবেছে, নোট করেছে নানা পয়েন্ট। তদন্তে জড়িয়ে পড়া চরিত্ররা তাই মিলেমিশে চলে এসেছে ঝিনুকের স্বপ্নে। যতবার মনে পড়ছে স্বপ্নটা, মনে-মনে হেসে নিচ্ছে ঝিনুক। একটু আগে যেমন নিল। মোটরবাইকে দীপকাকুর পিছনে বসে ঝিনুক এখন চলেছে সল্টলেকে সূর্য রায়ের বাড়ি। এই যাওয়ার সঙ্গে দেবাংশুবাবুর কেসের কোনও সম্পর্ক নেই। একটা ফোটোগ্রাফি এগ্‌জিবিশনে সূর্য রায়ের তোলা চারটে ফোটো নেওয়া হবে। প্রদর্শনীর বিষয় হচ্ছে, 'দ্য ওল্ড সিটি'। দীপকাকুর ফোটোগ্রাফার বন্ধুরা আয়োজন করছেন এই এগ্‌জিবিশনের। এরকম প্রদর্শনী ওঁরা নাকি প্রায়ই করে থাকেন। দীপকাকু অবশ্য ঝিনুককে কোনওদিনই নিয়ে যাননি। এই ধরনের নানা ব্যাপারে দীপকাকু জড়িয়ে থাকেন, প্রসঙ্গ না এলে সেসব উত্থাপন করেন না। ফোটোগ্রাফি নিয়ে দীপকাকুর যে এত ফান্ডা, সূর্য রায়ের অফিসে ছবিগুলো না থাকলে জানাই যেত না। ক্রিক রো-র সেই অফিস থেকে বেরিয়ে দীপকাকু বলেছিলেন, "নাঃ, লোকটার ফোটো তোলার হাত বেশ ভাল। এ লাইনে পড়ে থাকলে নাম করত।"

পরে হয়তো বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে দীপকাকু জানতে পেরেছিলেন সামনে একটা এগ্‌জিবিশন আছে। দীপকাকুর রিকোয়েস্টে সূর্য রায়ের ছবি নিতে রাজি হয়েছিলেন উদ্যোক্তারা। ফোনে দীপকাকু সেকথা জানিয়েছিলেন সূর্য রায়কে। বলেছিলেন, "পুরনো শহরের উপর বেশ কিছু ফোটো রেডি রাখুন। দেশ-বিদেশে যে-কোনও শহরের হলেই চলবে। আমি সেই ছবিগুলো বন্ধুদের দেখাব। ওরা সিলেক্ট করবে চারটে ফোটো। আপনি ফোটোগুলো এনলার্জ করতে দেবেন।"

সুযোগ পেয়ে খুবই উৎসাহিত হয়েছিলেন ভদ্রলোক। দীপকাকুকে বলেছিলেন, "আপনি আমার বাড়ি চলে আসুন। প্রচুর ফোটো দেখাব। আপনি ঠিক করে নেবেন কোন ফোটোগুলো বন্ধুদের কাছে নিয়ে যাবেন।"

দেবাংশুবাবুর কেস প্রায় শেষের মুখে, এই সময় দীপকাকু ট্র্যাকের বাইরের কাজ কেন নিলেন, বোঝা যাচ্ছে না। বেশ রিল্যাক্সড আছেন। অথচ আজই চিহ্নিত হয়ে যাবে অপরাধী। দীপকাকুর আর্টিস্ট যাবে পারমিতাদেবীর কাছে, উনি বর্ণনা করবেন এসি সার্ভিসিং করতে আসা লোকটার চেহারা। আর্টিস্ট ছবি আঁকবে। ধরা পড়ে যাবে চোর। দীপকাকু অবশ্য এটা মানছেন না। গতকাল দেবাংশুবাবুদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঝিনুক দীপকাকুকে বলেছিল, "তা হলে আগামীকাল ধরা পড়ে যাচ্ছে অপরাধী? ছবি লো পেয়েই যাচ্ছি আমরা।"

দীপকাকু বলেছিলেন, "না, তার চেয়েও বড় এভিডেন্স হচ্ছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট, যার রিপোর্ট পেতে আরও চারদিন লাগবে।"

"ছবি থাকলে লোকটাকে সহজে শনাক্ত করা যাবে," বলেছিল ঝিনুক।

দীপকাকু বলেছিলেন, "সেটা ডিপেন্ড করছে পারমিতা কতটা সঠিক বর্ণনা দিতে পারেন, তার উপর। হাতের ছাপ সেদিক থেকে অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। তবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে চোর ধরা গেলেও, যতক্ষণ না চুরিটা কীভাবে হয়েছে, মানে, চোর চাবি পেল কোথায়, বের করতে পারছি, অপরাধীকে পুরোপুরি দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। হিসেবমতো আমার কাজ এখনও অর্ধেক বাকি।"

স্বাভাবিক কারণেই দমে গিয়েছিল ঝিনুক, এত কিছুর পরও মাত্র ফিফটি পারসেন্ট কাজ এগিয়েছে। গাড়িতে গুম মেরে বসেছিল ঝিনুক। দীপকাকু হয়তো উৎসাহ জোগানোর জন্য বলে উঠেছিলেন, "সম্ভাব্য অপরাধীদের লিস্ট অবশ্য এখন অনেকটাই ছোট হয়ে এসেছে। বাদ পড়েছেন দেবাংশুবাবু। ডায়াগ্রামের কপি যে আছে, সেটা স্বীকার করেছেন। তথাগতকে তো আগেই সন্দেহের বাইরে রেখেছি। পারমিতাদেবীকেও রেহাই দেওয়া যায়। কারণ, এসি সার্ভিসিংয়ের লোকটার কথা উনিই বলেছেন। আমি নিশ্চিত, চুরি ওই লোকটাই করেছে। নিতাইকে তাই সন্দেহ করার আর কোনও মানে হয় না। লোকটা নিতাই নয়।"

ঝিনুক বলেছিল, "নিতাই যদি ছদ্মবেশে এসি সারানোর লোক হয়ে এসে থাকে?"

"ওর গলা শুনে চিনতে পারতেন পারমিতা। প্রায় নিয়মিত নিতাই ও বাড়িতে যাতায়াত করে," বলেছিলেন দীপকাকু।

ঝিনুক জিজ্ঞেস করেছিল, "বাপনের-মা'র বিষয়ে আপনার মতামত?"

"সেও নির্দোষ। রোজ ব্যাগটা হাতে তুলে মেঝে পরিষ্কার করত। চুরিটা যদি সে করে থাকে, ব্যাগে হাতের ছাপ রাখত না।"

দীপকাকু সত্যিই লিস্টটা একেবারেই ছোট করে দিলেন। পরক্ষণেই বলে উঠলেন, "আমার সমস্ত অনুমান মিথ্যে করে দিতে পারে ফিঙ্গারপ্রিন্ট। তাই ওটার ফোটো সবচেয়ে বেশি জরুরি।"

ঝিনুক আর কোনও কথা না বাড়িয়ে জানতে চেয়েছিল, "কাল তা হলে আমরা কখন বেরোচ্ছি?"

দীপকাকু বলেছিলেন, "কাল আর তুমি বেরিও না। বাইরের কাজ তো একটাই, দেবাংশুবাবুর বাড়ি গিয়ে আর্টিস্টের আঁকা অপরাধীর ছবিটা নিয়ে আসা। বাকি কাজ আমি অফিসে বসে ফোনেই সেরে

boierpathshala.blogspot.com

নেব।"

ঝিনুক দীপকাকুর কথা মানতে চায়নি। বলেছিল, "না, আমি আপনার অফিসেই চলে আসব। যাব দেবাংশুবাবুর ফ্ল্যাটে। ভীষণ কিউরিওসিটি হচ্ছে অপরাধীর ছবিটা দেখার জন্য। আপনার সঙ্গে যেসব কেসে ছিলাম, ছবি এঁকে অপরাধী ধরার ব্যাপারটা ছিল না।"

দীপকাকু আর 'না' করেননি। ঝিনুক সকাল সাড়ে দশটায় পৌঁছে গিয়েছিল দীপকাকুর অফিসে। দীপকাকু তখন ফোনে কথা বলছিলেন। সম্ভবত সান ট্র্যাভেলস-এর সঙ্গে। দীপকাকুর দু'টো প্রশ্ন শুনেছিল ঝিনুক। মানে করতে পারেনি। এক নম্বর প্রশ্ন, "মিস্টার সেনগুপ্ত ছাড়া কলকাতার আর কারও টিকিট কি বুক করেছিলেন ওই ফ্লাইটে?" দ্বিতীয় প্রশ্ন, "দেবাংশু সেনগুপ্ত কোন ফ্লাইটে যাচ্ছেন এবং ফিরছেন, এ ব্যাপারে কি কোনও কোয়ারি এসেছিল?" ও প্রান্তের উত্তর ঝিনুক শুনতে পায়নি, তাই প্রশ্নটাই ধোঁয়াশামার্কা লাগল। ঝিনুককে কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ না দিয়ে দীপকাকু বললেন, "চলো, সূর্য রায়ের বাড়ি যেতে হবে একবার।"

বাইকে আসার পথে দীপকাকু জানালেন, কেন যাওয়া হচ্ছে সূর্য রায়ের বাড়ি। এখন ঝিনুকের মনে হচ্ছে, এই কাজে তার না এলেও চলত।

অফিস টাইমের ব্যস্ত রাস্তা ছেড়ে ঝিনুকরা ঢুকে পড়েছে সল্ট লেকে। এখানে এলেই ঝিনুকের কীরকম একটা ভয়-ভয় করে। হারিয়ে যাওয়ার ভয়। একবার বাস থেকে নেমে এক বন্ধুর বাড়ি যেতে গিয়ে দু' ঘণ্টা সল্টলেকের গোলকধাঁধামার্কা রাস্তায় ঘুরেছিল। দীপকাকু কিন্তু একচাঙ্গে নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করালেন। নেমপ্লেটে 'জয়শ্রী রায়' এবং 'সূর্য রায়' লেখা।

চা এবং প্রচুর স্ন্যাক্স সহযোগে সূর্য রায়ের স্ত্রী আপ্যায়ন করলেন

শব্দসন্ধানের সমাধান

দ	শ	ভু	জা	■	■	■	ক	■	আ	প	দ	■	ম	হা	সা	গ	র	■	জ
নু	■	■	তী	র্থ	ক	■	নী	লা	কা	শ	■	■	য়	■	বে	■	ক	পি	ল
জ	গ	ন্ম	য়	■	র্ম	■	নি	■	শ	ম	ন	■	না	বি	ক	■	ম	■	ধ
■	■	■	প	■	জী	বি	কা	■	পা	■	ষ্ট	■	■	ব	■	■	স	ম	র
■	■	■	তা	জ্জ	ব	■	■	■	তা	লি	ম	■	স্ব	র্ণ	প	দ	ক	■	■
আ	চ	ম	কা	■	ন	বা	বি	চা	ল	■	তি	মি	র	■	ত	■	ম	ন্দি	র
ধু	■	শা	■	■	■	দ	■	লা	■	■	■	■	বি	হ	ঙ্গ	ম	■	■	ক্ত
নি	র	ল	স	■	আ	শা	জ	ন	ক	■	ম	ম	তা	■	■	দ	র	কা	র
ক	■	চি	ন্তা	বি	দ	■	■	■	ত	■	র	ত	ন	■	প	ত	ন	■	ঞ্জি
■	■	■	ন	বা	ব	জা	দি	■	শ	ত	দ	ল	■	■	ন্ম	■	পা	■	ত
উ	■	দা	■	হি	■	■	শা	ল	ত	রু	■	ব	ন	ভ	ব	ন	■	■	■
ৎ	■	মা	ন	ত	■	বে	হা	ল	■	ব	■	■	জ	ন	র	ব	■	যা	
স	ম্মে	ল	ন	■	■	তা	রা	না	■	র	হ	স্য	ঘ	ন	■	ক	ল	কা	তা
র্গি	■	■	দ	ফ	ত	র	■	■	■	■	ন	■	টি	■	■	■	বা	■	য়া
ত	ক্ষ	ক	■	ত্ত	■	বা	লি	কা	■	গ	ন	ত	কা	র	■	জ	ন	হি	ত
■	■	বি	চা	র	ক	র্তা	■	ল	হ	র	■	■	■	স	দ	ন	■	■	■
জ	ন	তা	■	■	পা	■	■	সা	■	মা	■	প	সা	র	■	ক	■	■	■
ন	■	ভ	■	ছ	ল	না	■	প	রা	গ	■	রা	■	চ	■	জ্ঞ	মি	জ	মা
প	র	ব	■	ত্রা	■	ট	■	■	গ	র	রা	জি	■	না	চ	ন	■	■	র্জা
দ	■	ন	■	ক	ন	ক	■	খ	ত	ম	■	ত	■	■	■	নী	লা	স্ব	র

boierpathshala.blogspot.com

ঝিনুকদের। সূর্য রায়ও খুব উত্তেজিত, এগ্‌জিবিশনে প্রথমবার ফোটো যাচ্ছে বলে কথা। অফিসে আজ দু' ঘণ্টা লেট করে ঢুকবেন, ঠিক করে রেখেছেন। দীপকাকু এখন সূর্য রায়ের তোলা ফোটোতে মগ্ন। বিভিন্ন সাইজের অজস্র ফোটো স্টেটার টেবিলে এনে রেখেছেন সূর্য রায়। সব ফোটো শহরের নয়। দীপকাকু শহরের ছবিগুলো আলাদা করছেন। হঠাৎ মনে পড়েছে, এভাবে মাথা তুলে সূর্য রায়কে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের বাথরুমটা কোথায়?"

"আসুন," বলে, সূর্য রায় ডেকে নিলেন দীপকাকুকে।

বাথরুম থেকে ঘুরে এসে দীপকাকু ফের ফোটোয় ডুবে গেলেন। ফোন বাজছে ওঁর। খেয়াল করছেন না। ঝিনুক সংবিৎ ফেরাল, "ফোন রিসিভ করুন!"

"অ্যাঃ, হ্যাঁ," বলে, পকেট থেকে ফোন বের করলেন দীপকাকু। স্ক্রিনে চোখ বুলিয়ে কানে নিলেন। বললেন, "হ্যাঁ, বলুন।"

ও প্রান্ত থেকে কোনও অপ্রত্যাশিত খবর এল। মুহূর্তে পালটে গেল দীপকাকুর এক্সপ্রেশন। পরপর যে কথাগুলো বললেন, তা হচ্ছে, "আসেনি অফিসে... বাড়ি থেকে ট্র্যাভেল ব্যাগ নিয়ে বেরিয়েছে... অফিসের টুরে কোথায় যাচ্ছে, বাড়িতে বলেনি... ঠিক আছে, আমি পুলিশ লাগাচ্ছি," ফোন অফ করে দীপকাকু বললেন, "আমি এই ভয়টাই পাচ্ছিলাম। পাখি পালিয়েছে!"

ঝিনুক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে?"

দীপকাকু বললেন, "তথাগত," একটু চুপ থেকে আপশোসের গলায় বলে উঠলেন, "আরও কেয়ারফুল থাকা উচিত ছিল আমার।"

থমথমে মুখে টেবিল থেকে গোটাদশেক ফোটো তুলে নিলেন দীপকাকু। সূর্য রায়কে বললেন, "একটা এনভেলপ দিন না।"

খাম এনে দিলেন সূর্য রায়। ওঁর মুখ থেকেও নিভে গিয়েছে একটু আগের উৎসাহ। উদ্বেগ মেশানো গলায় বললেন, "তথাগত মানে, দেবাংশুদার অ্যাসিস্ট্যান্ট। পালিয়েছে কেন?"

"ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে। দেবাংশুবাবুর জিনিসগুলো চুরি করেছে সে। ধরা অবশ্য পড়বেই। কলকাতার পুলিশের ক্ষমতা তো জানে না!" বলে, দীপকাকু ফোটোগুলো খামে পুরে উঠে দাঁড়ালেন।

দীপকাকুর বাইক সূর্য রায়ের বাড়ি ছাড়াতেই ঝিনুক জিজ্ঞেস করল, "আপনি তো তথাগতবাবুকে সন্দেহের বাইরে রেখেছিলেন।"

"তাতে কী হয়েছে, আমার অনুমান ভুল হতে পারে না।" বললেন দীপকাকু।

ঝিনুক জানতে চাইল, "আমরা কি এখন যাদবপুর থানায় যাচ্ছি?"

"না, দেবাংশুবাবুর ফ্ল্যাটে," বললেন দীপকাকু।

ঝিনুক বলল, "সেখানে গিয়ে আর কী হবে, চোর কে, সে তো বোঝাই যাচ্ছে।"

দীপকাকু বললেন, "তথাগত নিজে চুরি করেনি। করলে, পারমিতাদেবী ওকে চিনতে পারতেন। চুরি করিয়েছে অন্য কাউকে দিয়ে। আর্টিস্টের আঁকা ছবিটা চিনিয়ে দেবে সেই অপরাধীকে।"

॥ ৫ ॥

আর্টিস্ট যার ছবি এঁকেছে, কেউই তাকে চিনতে পারেনি। ব্যতিক্রম দীপকাকু, প্রসঙ্গ এলেই উনি শুধু মিটিমিটি হাসছেন। পারমিতাদেবী বলেছেন, ছবিটা নিখুঁত আঁকা হয়েছে। এই সেই লোক, যে এসি মেশিনটা সার্ভিসিং করতে এসেছিল। ছবিটা আঁকা হয়েছে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। একটা ব্যাপারে সামান্য হতাশ হয়েছেন পারমিতাদেবী, আর্টিস্টের পাকা হাত দেখে উনি নিজের একটা পোর্ট্রেট আঁকাতে চেয়েছিলেন। দীপকাকুর পাঠানো ইয়ং আর্টিস্ট কিছুক্ষণ চেষ্টা করে, ব্যর্থ হয়। পারমিতাদেবীকে বলে, "আপনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখের বর্ণনা দিন।"

"ধুত, এভাবে কখনও ছবি আঁকানো যায় না কি?" বিরক্তিসহ দীপকাকুকে কমপ্লেন করেছিলেন পারমিতা। ঝিনুক তখন সামনে দাঁড়িয়ে, একটু হলে হেসে ফেলছিল।

দীপকাকু পারমিতাদেবীর থেকে আর্টিস্টের আঁকা অপরাধীর ছবিটা নিয়ে বলেছিলেন, "ওরা কথার ছবি আঁকে। ওদের গুরু ফ্রান্সের বিখ্যাত আর্টিস্ট আলফোঁস বার্তিলঁ।"

গুরুগম্ভীর তথ্যের ভারে ঝিনুকের স্বতঃস্ফূর্ত হাসিটা মিলিয়ে গেল।

তারপর কেটে গিয়েছে দু'দিন। ফিঙ্গারপ্রিন্টের ফোটো এসেছে দীপকাকুর হাতে। আজ দেবাংশুবাবুর কেসের শেষ দিন। দীপকাকু কথা রেখেছেন, সঙ্গে নিয়েছেন বাবাকে। দীপকাকুর হাতে একটা ফাইল, মনে হচ্ছে ওর ভিতরেই রয়েছে রহস্য উদ্ঘাটনের নথিপত্র। বাবার গাড়িতে ঝিনুকরা চলেছে গড়িয়াহাটের কাছে এক হোটেলে। ওখানকার কনফারেন্স রুমে এই কেসটায় জড়িত লোকজনদের ডাকা হয়েছে। বাবা জানতে চেয়েছিলেন, "কাদের-কাদের ডাকলে?"

দীপকাকু বলতে চাইলেন না। বললেন, "কনফারেন্স রুমে গিয়ে দেখবেন।"

ঝিনুক জিজ্ঞেস করল, "তথাগতবাবু কি ধরা পড়েছেন?"

এই প্রশ্নেরও কোনও উত্তর দিলেন না দীপকাকু। চলন্ত গাড়ির জানলার বাইরে এমনভাবে তাকিয়ে থাকলেন, যেন কলকাতার সন্ধে পৃথিবীর অন্যতম এক সুন্দর দৃশ্য।

এর পর বাবা নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, "এত সাসপেন্সে রাখলে কিন্তু চলবে না। তা হলে আমরা তোমার কিসের কাছের লোক? চুরিটা অন্তত কীভাবে হয়েছে বলো।"

প্রস্তাবে রাজি হলেন দীপকাকু। বললেন, "হ্যাঁ, এটা আপাতত বলা যায়। চুরির পদ্ধতি ধরার ব্যাপারে আপনি এবং মিস্টার আফাং আমাকে বিরাট হেল্প করেছেন। দেবাংশুবাবুর ব্যাগের চাবিটা আফাংকে দেখাতে উনি বললেন, 'কলকাতায় এই চাবি বানানো সম্ভব নয়। চাবিটা সঙ্কর জাতীয় ধাতুতে তৈরি। এই মেটাল কলকাতায় অমিল। ভারতের অন্য কোনও বড় শহরে পাওয়া গেলেও, যেতে পারে।' এখানে যেসব মেটাল পাওয়া যায়, তা দিয়ে চাবিটা বানাতে গেলে একমাত্র আফাংয়ের কাছে আসতে হবে। কারণ, চাবির কাটিং ভীষণ জটিল। খুব সূক্ষ্ম হাতের কারিগর এবং বিশেষ কিছু যন্ত্র ছাড়া এই চাবি তৈরি করা যাবে না। আফাংয়ের কাছে এই চাবি কেউ করাতে যায়নি। গেলে, আফাং তৈরি করত না। এখানকার অ্যাভেলেব্‌ল মেটাল দিয়ে চাবিটা তৈরি করলে, হয়তো প্রথম ব্যবহারেই চাবিটা ভেঙে গর্তে পড়ে থাকত।...

"এসব শুনে আফাংয়ের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, এই চাবি কোথায় নিখুঁত এবং নির্ভরযোগ্যভাবে তৈরি করা সম্ভব? উনি তখন সিঙ্গাপুরের কথা বলেন। ওখানে ওঁরই কিছু দেশওয়ালি পরিচিত মানুষ সিমলিম স্কোয়ার অঞ্চলে ফুটপাতে বসে এই ধরনের চাবি তৈরি করে। তারা চাবি তৈরি করতে কম্পিউটার, স্ক্যানার পর্যন্ত ব্যবহার করে। ...এর পরই আমার মাথায় ঢুকে গেল, চাবি তৈরি হয়েছে সিঙ্গাপুরে। এক্ষেত্রে দেবাংশুবাবুর আসল চাবিটা হাতাতে হবে, সেটা কী করে সম্ভব? আপনার দ্বারস্থ হলাম, জিজ্ঞেস করলাম, বিদেশের হোটেলের সিকিউরিটির ফাঁকফোকর কোথায়? আপনি বললেন, 'একমাত্র রুম ক্লিন করার সময় একটু ফাঁক পাওয়া যায়। এ ছাড়া জিমনাস্টিক দক্ষতায় যদি সরিয়ে থাকে।' হোটেলের দেওয়াল বেয়ে ওই সব কায়দার রাস্তা চোর নেবে না। বাইরের লোকের চোখে পড়ে যেতে পারে। অতএব পথ একটাই, ঘর ক্লিন করার সময় ঢুকতে হবে তাকে। ইতিমধ্যে দেবাংশুবাবুকে ফলো করে সে দেখে নিয়েছে, ব্যাগ কেনার পর চাবিটা রেখেছেন কাঁধে ঝোলানো ছোট চামড়ার ব্যাগে, যেটায় পাশপোর্ট, ভিসা আছে। এর পরই ব্যাপারটা আমার কাছে জটিল হয়ে গিয়েছিল। দেবাংশুবাবু বলছেন যে, স্পেয়ার পার্টস কেনার পর একবারই মাত্র ব্যাগটা রুমে রেখে ঘণ্টাচারেকের জন্য শপিং করতে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় 'রুম মেকআপ' করতে ঢিয়ে যাননি। তা হলে চোর ঢুকল কী করে? এটা নিয়ে ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ আমার

boierpathshala.blogspot.com

মাথায় ক্লিক করে, আচ্ছা, এরকম তো হতে পারে, চোর উঠেছিল দেবাংশুবাবুর আশপাশের কোনও রুমে, নিজের ঘরের 'মেকআপ রুম'-এর বোর্ডটা ঝুলিয়ে দিয়েছিল দেবাংশুবাবুর দরজায়। সেটা দেখে ক্লিনিং স্টাফ দেবাংশুবাবুর রুম পরিষ্কার করতে ঢোকে, তখনই ক্লিনিং স্টাফকে কোনওভাবে বিভ্রান্ত করে চোর আসল চাবির ছাপ সাবানে বা অন্য কোনও আধুনিক জিনিসে নিয়ে নেয়। তারপর সেই ছাপ দেখিয়ে চাবি তৈরি করে নেয় সিমলিম স্কোয়ার অঞ্চলে বসে থাকা চাবিওয়ালাদের কাছে।"

দীপকাকুর কথা শেষ হতেই বাবা বলে বললেন, "অসাধারণ দীপঙ্কর। ইউ আর এ জিনিয়াস। এই পোড়া দেশে তুমি কতটা কদর পাবে, সেটা নিয়েই চিন্তা হয়। এবার বলো, চোরটি কে?"

বাবার প্রশংসায় কাজ হল না। দীপকাকু সেই যে চুপ করলেন, আর কোনও কথা বললেন না।

সবশেষে ঝিনুকরা পৌঁছল হোটেলের সামনে। কনফারেন্স রুমে ঢুকে ঝিনুক অবাক, পারমিতাদেবী আর লক্ষ্মী বেরা ছাড়া কেসে জড়িত সকলেই আছেন। তথাগতবাবু আছেন, হাতে হাতকড়া নেই। দেবাংশুবাবু, নিতাই, সমীরণ দাস, সূর্য রায়, বসন্ত আগরওয়াল এবং তাঁর উকিলবন্ধু।

বিরাট টেবিল ঘিরে বসে আছেন সকলে। দীপকাকু, ঝিনুক, বাবা গিয়ে বসলেন ফাঁকা তিনটে চেয়ারে। টেবিলে চায়ের কাপ দেখে বোঝা যাচ্ছে এক রাউন্ড হয়ে গিয়েছে। দীপকাকু শুরু করলেন তাঁর বক্তব্য, "প্রথমেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আবারও আমার পুলিশবন্ধুকে দিয়ে ফোন করিয়ে আপনাদের এখানে ডেকে আনানোর জন্য। দেবাংশুবাবুর কেসে এই মিটিংটার যে প্রয়োজন আছে, একটু পরেই সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন। এবার আপনাদের আমি চোরের ছবি দেখাই।"

পারমিতাদেবীর কাছ থেকে শুনে আঁকা ছবিটা দু'হাতে উপর-নীচে ধরে সকলকে দেখালেন দীপকাকু। ঝিনুক ছবিটা আগে দেখেছে। মাথায় টুপি, চোখে চশমা, গোঁফওলা বছর তিরিশ-পঁয়ত্রিশের একজন মানুষ।

ছবিটা টেবিলে রেখে দীপকাকু বললেন, "এই লোকটা দেবাংশুবাবুর ওয়ার্কশপের এয়ার কন্ডিশন মেশিন সার্ভিস করতে ঢুকেছিল। কিন্তু ছদ্মবেশে।"

ঝিনুক হাঁ হয়ে গিয়েছে দীপকাকুর কথা শুনে। বাকি সকলেরও নিশ্চয়ই একই অবস্থা।

দীপকাকু ফাইল থেকে আরও একটা ছবি বের করতে-করতে বললেন, "এবার আমি চোরের আসল চেহারাটা দেখাচ্ছি।"

পেনসিল স্কেচটা সকলের চোখের সামনে তুলে ধরতেই, সূর্য রায় ছিটকে উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে। এই আচরণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ, ছবিটা ওঁরই। সূর্য রায় বললেন, "আমাকে এভাবে ফাঁসানোর মানে? কাউকে দিয়ে আমার একটা ছবি আঁকিয়ে বলা হল, ইনিই চোর। বাঃ! এরকম আষাঢ়ে তদন্তের কথা কেউ কোনওদিন শুনেছে কি না, জানি না।"

"আমার বলা এখনও শেষ হয়নি সূর্যবাবু। আপনি যদি অপরাধী না হন, অযথা উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আপনাকেও বলার সুযোগ দেওয়া হবে।"

ভীষণ ঠান্ডা গলায় কেটে-কেটে বলা দীপকাকুর কথাগুলোর সামনে সূর্যবাবু খানিকটা মিইয়ে গেলেন। এসে বসলেন চেয়ারে। চোখ-মুখ রাগে গনগন করছে। দীপকাকু আপাতত নীরব থেকে সূর্য রায়ের ছবিতে পেনসিল চালালেন কিছুক্ষণ। ফের তুলে ধরলেন ছবিটা। অবিকল আগের ছবির মতো হয়ে গিয়েছে। দীপকাকু সূর্য রায়ের ছবিতে চশমা পরিয়েছেন, টুপি, গোঁফ এঁকেছেন। বললেন, "এবার?"

একটুও না ঘাবড়িয়ে সূর্য রায় বললেন, "এটাও এক ধরনের ভাঁওতাবাজি। প্রথমেই আমার ছবিটা এঁকে, চশমা, টুপি, গোঁফ অ্যাড করা হয়েছিল।"

দু'টো ছবিই দীপকাকু ফাইলে রাখলেন। মৃদু হেসে বললেন, "ছবিটা আমি তদন্তের সুবিধের জন্য বানিয়েছি।"

আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করার মতো প্রমাণ আমার হাতে আছে। মেনে নিচ্ছি, চুরিটাতে আপনার নৈপুণ্যের স্বাক্ষর লক্ষ করার মতো। কিন্তু সেই আপনিই প্রমাণ ছেড়ে গিয়েছেন অজস্র। যেমন, অতি বুদ্ধিমান চোরও ফেলে যায়। প্রথম প্রমাণ, যে হাতের ছাপ পাওয়া গিয়েছে চোরাংশুবাবুর বাড়ির ওয়ার্কশপের এসি মেশিনে, তার সঙ্গে আপনার হাতের ছাপ মিলিয়ে দিতে পারি। দেবাংশুবাবুর ছেলের অন্নপ্রাশনে ট্রেডের অনেকের মতো আপনিও নিমন্ত্রিত ছিলেন। তখনই বাড়ির ভিতরটা আপনার জানা হয়ে যায়। দেবাংশুবাবু আপনাদের এসি লাগানো নতুন ওয়ার্কশপটা দেখাতে নিয়ে যান। আপনি আন্দাজ করে নেন, স্পেয়ার পার্টসের ব্যাগটা দেবাংশুবাবু কাজের জায়গাতেই রাখবেন। মিলে যায় আপনার অনুমান। আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট রয়ে গিয়েছে আরও একটা জায়গায়, দেবাংশুবাবুর ব্যাগের ভিতরে রাখা কাগজপত্রে। নেক্সট," বলে দীপকাকু ফাইল থেকে বের করলেন দু'টো ফোটোগ্রাফ। দু'টোর সাবজেক্ট এক। দীপকাকু বললেন, "আপনার কাছে আমি এগ্‌জিবিশনের ফোটো নিতে যাইনি, এই ফোটোটা খুঁজতে গিয়েছিলাম (ডান হাতের ফোটোটা দেখালেন), আর এই ফোটোটা (বাঁ হাতের) দেবাংশুবাবুর তোলা। সিঙ্গাপুরের একটা হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের পিছনে উঠেছে হাইরাইজ বিল্ডিং। সেই বহুতলের মাথায় সাদা মেঘের গোলাকার যে অংশটা দেখা যাচ্ছে, আপনাদের দু'জনের ফোটোতেই সেটা আছে। অর্থাৎ, ফোটোটা আপনারা ঘণ্টাখানেকের তফাতে হলেও তুলেছেন একই জায়গা থেকে। স্থানটি হচ্ছে হোটেল গ্র্যান্ড ম্যাক্স। ভিন্ন জানলা থেকে তুলেছেন বলে, ফোটোর অ্যাঙ্গেল একটু আলাদা।"

একটু থেমে ফের শুরু করলেন দীপকাকু, "আপনার অফিসে টাঙানো সমুদ্র-দূষণের ফোটোটা দেখিয়ে আপনি যদি মিথ্যে কথা না বলতেন, আমি আপনার তোলা অন্য ফোটোগুলো দেখতে যেতাম না। ফোটোর বিষয়টা এতটাই মর্মস্পর্শী, আমি পরে খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারি, সমুদ্রের ওই দৃশ্যটা কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর যাওয়ার পথে পড়ে না, সিঙ্গাপুর থেকে কুয়ালালামপুর যাওয়ার সময় দেখা যায়। ওই সময় সকালের দু'টো ফ্লাইট আছে। এর পরই আপনার প্রতি সন্দেহ গাঢ় হয় আমার। কেন বলছেন, বিদেশ যাত্রা বলতে গত পাঁচ বছরে একবারই শখ করে সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই গোপন করতে চাইছেন কিছু। মডার্ন ইলেকট্রনিক্সের প্রতি আপনার এতটাই আগ্রহ, আপনি সিঙ্গাপুর তো বটেই, কুয়ালালামপুর পর্যন্ত নিয়মিত যাতায়াত করেন। অথচ আমাকে বলেছেন, আপনি শুধুমাত্র মেশিন সারাই করে থাকেন, দেবাংশুবাবুর মতো চ্যালেঞ্জিং কাজে হাত দেন না। আপনার মিথ্যে প্রকাশ্যে আনার রাস্তা আমি পেয়ে গেলাম দেবাংশুবাবুর তোলা ফোটো দেখার পর। আমার মনে হল, এগ্‌জিবিশনের টোপ দিলে, আপনি আপনার সমস্ত ফোটোই আমাকে দেখিয়ে ফেলবেন। সিঙ্গাপুরের লেটেস্ট ফোটো দেখার জন্য আমি এগ্‌জিবিশনের থিমটা নিজেই বানালাম, দ্য ওল্ড সিটি। দেবাংশুবাবুর তোলা লিট্‌ল ইন্ডিয়ার ফোটোতে আমি পুরনো সিঙ্গাপুরকে পেয়েছি। আপনি আমার ফাঁদে পা দিলেন। দেখিয়ে ফেললেন সিঙ্গাপুরে আপনার তোলা রিসেন্ট ফোটোগুলো। এর পরও আমি দেবাংশুবাবু যে ট্র্যাভেল এজেন্সি থেকে টিকিট বুক করান, সেখানে খোঁজ নিই, দেবাংশুবাবুর ফ্লাইটে ওরা কলকাতার আর কারওর টিকিট বুক করেছে কি না? ওরা বলল, 'না।' কিন্তু একজন দেবাংশু সেনগুপ্তর বন্ধু বলে পরিচয় দিয়ে ফ্লাইট নম্বর জেনেছিল ফোন মারফত। আপনিই সেই লোক, যিনি অন্য ট্র্যাভেল কোম্পানির মাধ্যমে দেবাংশুবাবুর ফ্লাইটের একটা টিকিট নিজের জন্য বুক করিয়ে ছিলেন। এবং গোটা পথটাই ছিলেন দেবাংশুবাবুর চোখের আড়ালে। আপনি যে সিঙ্গাপুরে সেই সময় গিয়েছিলেন, তার মস্ত প্রমাণ আমার পুলিশবন্ধু ইমিগ্রেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে জোগাড় করে দিয়েছে কালই। বিদেশ বলে আপনি ছদ্মনাম ব্যবহার করতে পারেননি। পাশপোর্ট দেখিয়ে ভিসা পেতে

boierpathshala.blogspot.com

হয়েছে। আমি এর পর ফোনে যোগাযোগ করি গ্র্যান্ডম্যাক্স হোটেলে। ওরা বলে যে, আপনি দু'শো পাঁচ নম্বর রুমে ছিলেন। দেবাংশুবাবু ছিলেন একটা রুম বাদ দিয়ে।"

একটানা কথা বলে, দম নেওয়ার জন্য দীপকাকু থামলেন। সূর্য রায়ের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে। দরদর করে ঘামতে লাগলেন। ঝিনুকের মনে পড়ল, ইনি চেয়েছিলেন তাঁর পোর্ট্রেট তুলতে। এখন এঁরই একটা ফোটো তুলতে ইচ্ছে করছে ঝিনুকের।

ফের শুরু করলেন দীপকাকু, "সূর্যবাবু, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, আপনার বাড়িতে ফোটো দেখার সময় আমি একবার বাথরুমে গিয়েছিলাম। যাওয়াটা ছিল ছুতো। দেবাংশুবাবুর তোলা ফোটোর মতো একই ফোটো আপনার কাছে দেখতে পেয়ে, বাথরুম যাওয়ার বাহানা করি। বাথরুম থেকে ফোন করি দেবাংশুবাবুকে। বলি, 'একটু পরে আমায় ফোন করে বলুন, তথাগত পালিয়েছে।' আপনার সামনে সেই ফোন এসেছিল। আপনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, যাক, সন্দেহটা তা হলে অন্য লোকের উপর পড়েছে। সেই ভরসায় আপনি এখনও দেবাংশুবাবুর স্পেয়ার পার্টস, ডায়াগ্রাম বাড়ি অথবা অফিসে রেখে দিয়েছেন। আমি যদি এখনই থানায় একটা ফোন করি, পুলিশ গিয়ে আপনার বাড়ি, অফিস সার্চ করে জিনিসগুলো বের করে ফেলবে।"

টেবিলের উপর মাথাটা নামিয়ে দিলেন সূর্য রায়। নিস্তব্ধ হয়ে আছে গোটা ঘর। দীপকাকুর রহস্য উন্মোচনে সকলেই হতবাক। একটু পরে দীপকাকুই বলে উঠলেন, "আপনাদের সকলকে এক জায়গায় ডেকেছি একটা কারণে, আমি চাই না এই কেসটা পুলিশ হ্যান্ডেল করুক। আপনারা নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিন। ছোট্ট একটা সার্কেলের ভিতর হয়েছে চুরিটা, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে এর তেমন যোগাযোগ নেই। আপনারা প্রত্যেকেই গুণী মানুষ, ভুল শুধরে নেওয়ার একটা সুযোগ দিন সূর্যবাবুকে। উনিও যথেষ্ট প্রতিভাধর ইঞ্জিনিয়ার। অবশ্য আমার অনুরোধ অনায়াসে অগ্রাহ্য করতে পারেন দেবাংশুবাবু। চোর ধরার জন্য অ্যাপয়েন্ট করেছিলেন আমাকে। সূর্যবাবুকে পুলিশে দেবেন কি না, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার একমাত্র ওঁরই আছে। আমি শুধু নিজের চার্জটা মকুব করে দিতে পারি।"

দেবাংশুবাবুর ডিসিশন শোনার জন্য মুখ তুললেন সূর্য রায়। চোখে করুণা ভিক্ষা। দেবাংশুবাবু ওঁর দিকে না তাকিয়ে বললেন, "আমিও পুলিশের ঝামেলায় যেতে চাই না। সূর্য যদি আমার টেকনোলজি অন্য কোম্পানিকে বিক্রি করতে যায়, বাধ্য হব পুলিশের কাছে যেতে।"

টানা চুপ করে বসে থাকার পর হঠাৎ কথা বলে উঠলেন সমীরণ দাস, "আচ্ছা, আবার আমাকে পুলিশ দিয়ে এখানে ডেকে পাঠানোর কারণটা জানতে পারি কি?"

দীপকাকুর মুখে হাসি খেলে গেল। বললেন, "দেবাংশুবাবুর প্রতি আপনার ভুলটা ভাঙিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। এবার নিশ্চয়ই মানবেন, দেবাংশুবাবু অনেক উঁচুদরের ইঞ্জিনিয়ার। অযথা অসূয়া পুষে রাখবেন না। মিথ্যে প্রচার করবেন না ওঁর নামে। বরং বন্ধুত্ব করে নিন।"

বরফ কতটা গলল, কে জানে! গুম হয়ে রইলেন সমীরণ দাস। এবার মিস্টার আগরওয়াল জানতে চাইলেন, "আমাকে ডাকলেন কেন?"

দীপকাকু বললেন, "আপনাকে ডেকেছি একটা রিকোয়েস্ট করতে, এই সব চুরিটুরির ব্যাপার দেখে আপনি যেন পিছিয়ে না যান টেকনোলজিটা কিনতে। দেবাংশুবাবু অনেক মেধা, পরিশ্রম দিয়ে জিনিসটা আবিষ্কার করেছেন।"

বসন্ত আগরওয়াল হাসলেন, বললেন, "টেকনোলজি আমি কালই কিনে নেব। পরশু বিক্রি করে দেব পাঁচটা কোম্পানিকে। রেট নেব দু'লাখ। মেশিন আপগ্রেডেশনে আমার কোনও খরচ হল না।"

দীপকাকু বললেন, "কিন্তু কম্পিটিশনে তো আপনি এগিয়ে থাকতে পারবেন না।"

"সে আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। একবার যখন ডায়াগ্রাম বাইরে গিয়েছে, অন্য কোম্পানি সেটা পাবেই। তার আগেই যা লাভ করার, করে নিতে হবে আমাকে।"

তারিফ করার দৃষ্টিতে বসন্ত আগরওয়ালকে দেখলেন দীপকাকু। এমন সময় ওঁর ফোন বেজে উঠল। নম্বরটা চেনা নয়, স্ক্রিনে চোখ রেখেই কানে তুলে নিলেন সেটটা। 'হ্যালো' বলার একটু পরেই বলে উঠলেন, "খুন হয়েছেন! আমি এখনই যাচ্ছি।"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কে খুন হল?"

"সেই ভদ্রমহিলা। আমার অফিসে আপনারা দেখেছিলেন। সব সময় ভয়ে থাকতেন, কেউ বুঝি তাঁকে ফলো করে যাচ্ছে," বলে দীপকাকু বাকি সকলকে বললেন, "সরি, আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। আপনারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা সেরে নিন।"

ঝিনুক তাড়াতাড়ি দীপকাকুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বাবা বললেন, "খুনটুন আমার একটুও সহ্য হয় না। তোমরা গাড়িটা নিয়ে যাও। আমি ট্যাক্সি ধরে বাড়ি চলে যাব।"

দেবাংশুবাবুর কেসের সাফল্য উপভোগ করা হল না। কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে গাড়ীর মুখে সিঁড়ি ভাঙতে লাগলেন দীপকাকু। গাড়ীর্য কিছুটা ধার করে ঝিনুকও নামতে লাগল পিছনে। দীপকাকুর মতোই গত কেসের সাফল্য এখন তার কাছে অতীত !

pathagar.net